

অন্তর্জাল

BanglaBook.org

কাবেরী রায়চৌধুরী

অন্তর্জাল

কাবেরী রায়চৌধুরী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



সাহিত্যম্ ॥ কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

ANTARJAL

By KABERI ROYCHOWDHURY
SAHITYAM

18B Shyamacharan Dey Street
Kolkata 700 073

(033) 2241 9238

(033) 2241 4003

Fax : (033) 2241-3338

E-mail nirmalsahityam@gmail.com

Web www.nirmalsahityam.com

প্রকাশক :

নির্মলকুমার সাহা

সাহিত্যম্

১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :

নির্মল বুক এজেন্সি

২৪ বি কলেজ রো

কলকাতা ৭০০ ০০৯

অক্সফোর্ড বুক স্টোরস্, স্টোরি, স্টারমার্ক,

হুইলার ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে

মুক্তধারা নিউইয়র্ক, সঙ্গীতা বুকস লন্ডন,

আনন্দধারা অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম ঢাকা

মুদ্রক :

লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কসবা ইন্ডাসট্রিয়াল এস্টেট

কলকাতা-৭০০১০৮

বর্ণগ্রন্থন :

অনুপম ঘোষ

পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স

২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : শাওন সুলতানা

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০১৭

মুদ্রণসংখ্যা ১১০০ কপি

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর
লিখিত অনুমতি ছাড়া এই
বইয়ের কোনও অংশেরই
কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা যাবে না,
কোনও যান্ত্রিক উপায়ের
(গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা
অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন
ফোটোকপি, টেপ বা
পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত
তথ্য সঞ্চয় করে রাখার
কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে
প্রতিলিপি করা যাবে না বা
কোনও ডিস্ক, টেপ,
পারফরেটেড মিডিয়া বা
কোনও তথ্য সংরক্ষণের
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন
করা যাবে না। এই শর্ত
লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

₹: 100.00

প্রিয় চুমকি (দি) চ্যাটার্জিকে

প্রোফাইল পিকচারটা আবার দেখল লিজা। চোখে পড়ার মতোই সুন্দর। একেবারে হ্যান্ডসাম যাকে বলে, চোখটানা সুন্দর ব্যক্তিত্ব। পাইলট। লুফথান্সার পাইলট। কোনও ‘হাইড’ নেই। সাধারণত অনেকেই নিজের আইডেনটিটি গোপন রাখে আজকাল, প্রাইভেসি ব্যবহার করে। এই লোকটি তা করেনি।

আন্দ্রেই দেবাশিস সরকার! পাইলট, এয়ার লুফথান্সা। বয়স বত্রিশ। ঠিকানা জার্মানির হামবুর্গ। জেন্ডার মেল, লাইকস মেন অ্যান্ড উইমেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিছানায় এপাশ থেকে ওপাশ করল লিজা। উপুড় হয়ে শুয়ে দেখছে আন্দ্রেই দেবাশিসের বিভিন্ন ফোটোগ্রাফস্। এই দেবাশিস তাকে যে টেক্সট করেছে ইনবক্স-এ সেটা আবার পড়ল সে।

সুইটহার্ট,

আমরা কি বন্ধু হতে পারি?

আচমকাই ঈশ্বরের কৃপায় তোমার প্রোফাইলটা দেখতে পেলাম ফেসবুকে। আমার দুচোখ আর ফেরাতে পারি না তোমার ছবি থেকে। অনেক সুন্দরী দেখেছি কিন্তু তোমার মতো আকর্ষণ আর কারুর জন্য ফিল করিনি কখনো।

তুমি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেই আমরা বন্ধু হব। জোর করছি না, ইফ ইউ উইশ...

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ মধ্যরাত পর্যন্ত কয়েকশোবার পড়া হয়ে গেছে টেক্সট। কেমন একটা ভালোলাগার অনুভূতি হচ্ছে।

স্বপ্নের পুরুষ যেন! হ্যাঁ চোখ বন্ধ না করেও এমন পুরুষের কল্পনাই তো সে করেছে বয়ঃসন্ধির পর থেকে আজ পর্যন্ত।

তাহলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করেই নেওয়া যাক। বুকের ভেতর অদ্ভুত উদ্ভেজনা। একটু রাগও হচ্ছে বটে লোকটার ওপর। তার যত বন্ধু কি সব মেয়েই হতে হবে? কেন বাবা একটা দুটো ছেলে ছাড়া আর তো কেউ তার ছবিতে কमेंট করে না! আর মেয়েগুলো? কেমন হ্যাংলার মতো! দেবাশিস

একেকটা করে তার ছবি পোস্ট করেছে আর মেয়েগুলো হ্যাংলা নির্লজ্জের মতো কमेंট করেছে!

‘ছিছিছি’! আপন মনেই গালি দিল লিজা।

অ্যাকসেস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দ্রেই দেবাশিসের প্রোফাইলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

—হাই! থ্যাঙ্কস্ ফর অ্যাকসেস্টিং মি।

—ওয়েলকাম।

কলেজের অধ্যাপনা তাকে কিছুটা গাভীর্য দিয়েছে। এমনিই বরাবর চাপা স্বভাবের মেয়ে সে। স্বভাব প্রাগোজ্জ্বল হলেও নিজের ভালোলাগা না লাগার বহিঃপ্রকাশ হতে দেয় না। এই ফেসবুকেও কত যে হাতছানি। কোনওটাতেই প্রশংসা দেয়নি সে। অমন তার বন্ধুবান্ধীরা প্রায় সবাই খুচরো প্রেম করছে এই ফেসবুকেই। কলেজে সেই নিয়ে কত হাসাহাসি। ফান! আবার পূর্ণিমা বলে ইতিহাসের অধ্যাপিকার হৃদয় ভাঙল সেইদিনই এই ফেসবুকে!

কুয়েতের কোন্ এক শেখের প্রেমে এমন হাবুডুবু খাচ্ছিল পূর্ণিমা! অনেকেই তাকে সাবধান করেছিল। কেমিস্ট্রির কুবলয় সেন পূর্ণিমাকে নাকি মনে মনে ভালোবাসত। সেই কুবলয় সেনকেই মানসিক আঘাত হানতে গর্বের সঙ্গে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছিল

পূর্ণিমা, দীপকের মতো হ্যান্ডসাম কোথায় এই বাংলায়? রাস্তাঘাটে কি একটাও সুপুরুষ চোখে পড়তে নেই? ওহ্! দীপক যা রান্না করে না? একেকটা আইটেমের রেসিপি পাঠায়, পড়েই জিভে জল!

কুবলয় সেন শুনত, আর হাসত। একদিন বলেই ফেলল, একদিন আপনার হবু-র রেসিপি রেঁধে খাওয়ান আমাদের কুয়েত বলে কথা!

সেই শুনে পূর্ণিমা বলল, ও আসবে এই ডিসেম্বরে। ওই রান্না করে খাওয়াবে। আপনি অবশ্যই নিমন্ত্রণ পাবেন। মন খারাপ করবেন না প্লিজ্‌ইইজ্‌।

কুবলয় সেনের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেছিল মুহূর্তে। বলেছিল, অপেক্ষায় রইলাম মিস্ মুখার্জি। আপনার হবুর হাতের রান্না খাওয়ার জন্য। অনেক শুভেচ্ছা।

সেই পূর্ণিমার আত্মহত্যা করার মতো অবস্থা হল ডিসেম্বরে।

এল না তার কুয়েতের প্রেমিক। তাকে রাত দু-টোয় এয়ারপোর্টে রিসিভ করার জন্য আসতে বলেছিল সেই প্রেমিক। গদগদ আহ্লাদে পূর্ণিমা কলেজে সবাইকে জানিয়েছিল কাল আসছে গো।

আমি যাচ্ছি রিসিভ করতে। ইস্! কী যে এক্সাইটমেন্ট বলে বোঝাতে পারব না!

কুবলয় সেন বলেছিল, ম্যাডাম, একটা কথা বলি যদি কিছু খারাপ না ভাবেন—।

প্রফেসরস রুমে সবাই চমকে উঠেছিল কুবলয়ের কথা শুনে। পূর্ণিমা অহঙ্কারী রাজহংসীর মতো গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল।

—বলুন।

—আপনি অত রাতে একা যাবেন না প্লিজ। দিনকাল ভালো নয়—। আর আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার মনের মানুষটিকে সামান্য সামনি দেখেননি ম্যাডাম! কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পূর্ণিমা বিদ্রূপ করে হেসে বলেছিল, আপনি যেতে চান নাকি?

—না ম্যাডাম। আপনার বডিগার্ড হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

সেই পূর্ণিমা তারপর দিন থেকে আর কলেজে আসে না। প্রথম ক'দিন সবাই বলল, পূর্ণিমা ফেঁসেছে কুয়েতিতে! তারপরও কয়েকদিন সম্পূর্ণ নিখোঁজ থাকার পর সকলেই বলাবলি করতে শুরু করল, একটা ফোন পর্যন্ত করল না!

বাংলার রমাদি বললেন, একটা ফোন করিবে ভাই পূর্ণিমা। আমার কিন্তু একটু ভয়ই লাগছে।

তারপরই সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনল সেই গল্প। পূর্ণিমা নাকি হাউমাউ করে কেঁদেছে প্রায় দশ মিনিট রমাদির ফোন পেয়ে। অবশেষে জানিয়েছে, সে এসেছিল কিন্তু তাকে চিনতে অস্বীকার করেছিল। দীপক কুণ্ডকে দেখার পরেই ছুটে গেছিল পূর্ণিমা। আর দীপক ও তার দুইবন্ধু অবাক হয়ে তাকে বলেছিল, হু আর ইউ?

‘আমি পূর্ণিমা তোমার ফিঁয়াসে... ফেসবুকে...’ বলতেই দীপক নাকি তার দুই বন্ধুকে বলেছিল, ওহ গড্! কতবড় র‍্যাকেট দেখো। সিস্টিটিউটদের চক্র কতবড় সক্রিয়! ইমাজিন!’ পূর্ণিমা রমাদিকে বলছিল, সে সুইসাইড করবে। সে এতবড় অপমান নিয়ে কীভাবে মুখ দেখাবে সমাজে? আত্মীয় বন্ধুদের কাছে?

যদিও কুবলয় সেন আর তা হতে দেয়নি। কুবলয় সেনের সঙ্গেই বিয়ে তার আগামী বছরের শুরুতে।

দেবাশিসকে ‘মাই প্লেজার’ লেখার পর কিছুটা চুপ করে গেছে লিজা। অপরিচিত মানুষকে এর বেশি লেখার অভ্যাস নেই তার।

দেবাশিস লিখছে, তুমি প্রফেসর? ওহ ডিয়ার! শিক্ষকদের প্রতি আমার অনেক রেসপেক্ট।

—থ্যাঙ্কস্।

ওনলি থ্যাঙ্কস্—?

দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করছে সে কথা বলার জন্য। কিন্তু কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে সে। অভ্যাস নেই বেশি ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা আদান প্রদানে।

—চুপ করে ডিয়ার?

একটি ‘হ্যাপিইমো’ পাঠাল সে এবার।

দেবাশিস লিখছে, আমার সম্পর্কে তো তুমি কিছুই জানো না! তাই না!

—জানি। গন থু ইয়োর প্রোফাইল।

—হা হা হা...প্রোফাইলে একটা আস্ত জীবনের সব কিছু লেখা থাকে নাকি? সো পুইট—! তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার জন্য খুব ইমপর্ট্যান্ট ডিয়ার। বুঝেছ বন্ধু?

—আচ্ছা।

—শুধু আচ্ছা? তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড নও? দেখো এই ইচ্ছা যদি শুধু আমার তরফ থেকে হয়, তাহলে আমি আর তোমায় ডিস্টার্ব করব না।

—না, না। তা নয়। আসলে আমি আপনাকে কতটুকু চিনি বলুন? কারুর পার্সোনাল ব্যাপারে আমার ততটুকুই আগ্রহ যতটুকু পাশাপাশি চলতে

গেলে লাগে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই তার পার্সোনাল ব্যাপারটি প্রাইভেট। যে যতটুকু বলে ততটুকুই শুনি।

—হা হা হা হা... দারুণ বলেছ। এটা আমরা যদি সবাই মেইনটেইন করতে পারতাম ডার্লিং! বাট আমি মনে করি আমি যদি কারুর বন্ধুত্বকে খুব মর্যাদা দিতে চাই তাহলে দু'জনের মধ্যে কোনও গ্যাপ থাকা চলবে না। তুমিও বলবে সব। আমিও—। রাজি?

—ওকে।

—ওকে ডিয়ার এখন আমার ফ্লাইট। আর হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে প্লেন টেক অফ করবে।

—কোথায় যাবে?

—এটা ডোমেস্টিক। পাথ এ যাব। ল্যান্ড করে তোমায় আবার ফোন করব। ...ওহ্ সরি, ফোন তো না, টেক্সট করব। হা হা হা... বাই বাই।

সবুজ আলোটা নিভে গেল দেবাশিসের আইডি থেকে।

মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছে লিজার। এমন তো কখনো হয়নি! কত মানুষই তো তার ফেসবুকের বন্ধু। যদিও এই ভারচুয়াল ওয়ার্ল্ডে বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। বন্ধুত্বের সম্পর্কও বেড়েছে। কিন্তু আজকের মতো এমন

অনুভূতি কখনোই হয়নি। কেন জানি মনে হচ্ছিল, আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী? খুব কম মানুষের সঙ্গেই এমন হয় যে মনে হয় আরও একটু কথা বলি, কাছে থাকি। আজ এমনই মনে হল।

ভাবনাটা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেলল লিজা। তাহলে কি প্রেমে পড়লাম? ভাবতে গিয়ে আবার হাসি। প্রেম? তার দ্বারা? অসম্ভব একটা ব্যাপার। আজ পর্যন্ত কারুর ডাকেই সাড়া দেয়নি সে। এ বিষয়ে তার একটু বদনাম-ই আছে। অহংকারী বলে লোকে।

রাত কত হল? জানালা দিয়ে নিশিচ্ছিন্ন অন্ধকার মাখা রাতের দিকে চেয়ে রইল সে। সময় দেখল মোবাইলে। আড়াইটে, রাত! এত রাত পর্যন্ত কোনওদিন সে জেগে থাকেনি।

দেবাশিসের প্রোফাইলে ঢুকল সে আবার। ছবিগুলো দেখবে। একটু চমকে গেল। অ্যাক্টিভ দু-মিনিট আগে! তার মানে হিসাব মত দু-মিনিট আগে সে অনলাইন ছিল! আর তো এখন উড়ানে থাকার কথা! তাহলে কি সময়ের হিসেবের ভুল হল? হবে হয়তো!...

‘হাই হানি! হাই! হাই হানি...!’ মাথার ভেতরে

শব্দগুলো ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। ধাক্কা মারছে।
আঘাত করছে। যন্ত্রণা! ক্ষত! রক্তক্ষরণ হচ্ছে!

—হাই! গুড মর্নিং!

—মর্নিং!

—আমি আলিয়া বলছি।

—আলিয়া! হ্যাঁ বলুন।

—আমাকে ‘তুমি’ বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে
দেখা করতে পারব কবে?

—আলিয়া মানে আপনি স্যরি তুমি নয়নিকাদির
পরিচিত সেই...।

—ইয়েস। দ্যাট ইজ মি।

—আলিয়া! আলিয়া তোমায় নয়নিকা কি সব
বলেছে?

—না, একটু সাম আপ করে। আমি আপনার সঙ্গে
সামনাসামনি কথা বলতে চাই। আমি আর আমার
ফ্রেন্ড ঋষি আসব। কখন আসব বলুন? আগামীকাল
স্যাটারডে। আমাদের দু-জনের জন্য বিকেল হলে
সুবিধা হয়।

—এসো, এসো। এসো তোমরা তোমাদের টাইম
মতো। আমি তো কোথাও বেরোচ্ছি না—! আমি
আর বাড়ি থেকে বেরোই না কতদিন হল—।

—ও কে, দিদি আমরা আসব। বাই।

—ব্যাপারটা একটু ডিটেল বল্। ‘মাথা কাজ করছে না এই গরমে। পুরো মেন্টেড!’

লাইব্রেরির পাশে নির্জন সবুজ ঘাসের ওপর শরীর মেলে দিয়েছে ঋষি। কলেজের এই প্রান্তের নির্জনতাই তার পছন্দ। আলিয়া আর তার আড্ডা মারার জায়গা। ঘাসের ডগা দাঁতে কাটছে আলিয়া। একটু তিতকুটে স্বাদ। তবু আড্ডা মারতে মারতে ঘাষ চিবিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা।

ঘাসের রস আস্বাদন করতে করতে বলল, ঘটনাটা সলুভ করার মধ্যে একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক করার আনন্দ পাব। অবিশ্বাস আর অসততা! ডিসট্রাস্ট আর ডিসঅনেস্টি!

সারা পৃথিবীটা যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না? আর বিশ্বাস না করে মানুষ বাঁচতে পারবে?

আলিয়া যে অনেক সেনসিটিভ সে বিষয়ে ধারণা আছে ঋষির। একটু আবেগ বেশি তার। মূল ঘটনায় যাওয়ার আগে তার ‘আফটার এফেক্টস্’ সম্বন্ধে অনেক ভাবে, অনেক বলে সে। তাই চোখ বন্ধ করে

শুয়ে রইল সে, জানে আরেকটু পর আলিয়া মূল প্রসঙ্গে আসবে।

—বুঝলে? আন্ডারহ্যান্ড? ঋষি?

—ইশ্হ, আই ক্যান।

—শোন, নয়নিকাদি আমার...

—তোর ইংলিশ টিচার, এই তো?

—হুম্। নয়নিকাদি আমায় লিজা চৌধুরির কেসটা বলল। যা করার ইমিডিয়েট করতে হবে। খুব বিপদে পড়ে আছেন উনি। ফেসবুক র‍্যাকেট! ভালোনারেবল — কেস। কাল যাব আমরা মিট করতে।

—আমরা? আমিও? চোখ বন্ধ ঋষির। তার এই কথার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে সে। ছোটখাটো একটা সুনামি আছড়ে পড়বেই!

—আমিও! ওহ্! ইগো! আমরা মানে তুই আর আমাকেই বোঝায় জানি। কিন্তু তুই... ওহ গড্! আমিও...? এর মানেটা কী? এর মানেটা কী বল?' ঝড় বয়ে গেল, সঙ্গে তুফান। অথবা সুনামিও হতে পারে।

নাহ্, আর রাগানো ঠিক হবে না। এখনই একটা বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা বুঝেই হেসে জড়িয়ে ধরেছে ঋষি আলিয়াকে। বলল, তোকে একটু রাগাই বুঝিস্ না কেন জান? কী যে সুইট লাগে তোকে! তুই তো আর

আয়নায় দেখিস্ না নিজের থোবড়াটা? হা হা...!

—থোবড়া? আমার মুখটা থোবড়াটা হল?

—আচ্ছা, মুখশ্রী, হল? হ্যাপি?

—হুম্ম।

—এবার বলো মাতাজি।

—খিলখিল করে হাসছে আলিয়া। এই হাসিটা এনজয় করে ঋষি।

হাসি থামতে বলল, শোন্ নয়নিকাদির একেবারে চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড লিজা চৌধুরি। আন ম্যারেড। একটা কলেজে পড়াচ্ছেন। প্রাইভেট কলেজ।

—কোন্ কলেজ?

—বিবেকানন্দ?

—গট।

—একটা চক্রে পড়েছেন। ওঁর অনার অ্যাট স্টেক। আর ব্যান্ড ব্যালেঙ্গ ইন ভালোনারেবল পজিশন! থু ফেসবুক। ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড। যতটা সহজ ভাবছিল ততটা নয়।

—পুলিশকে জানিয়েছেন? সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ে ঘটনাটা।

—না। লজ্জায় জানাননি।

—লজ্জা!

—নয়নিকাদি তাই বললেন। ওঁর বন্ধু খুবই ইন্টোভার্ট টাইপের। আর খুব ভালোমানুষ।

—কিন্তু পুলিশের হেল্প ছাড়া ব্যাপারটাকে আলটিমেটলি গুটিয়ে আনা যাবে না।

—সেটা পরে দেখব। আমিও জানি সেটা। অ্যাট লাস্ট আইন।

—ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছে?

—গোলমালে। কাল যাচ্ছি তো—। তুই কোনও কাজ রাখিস না। মানুষ কেমন হয়ে যাচ্ছে না? মানুষ মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলা করে! জংলি জানোয়াররাও একমাত্র হান্ট করে ফর ফুড। নট ফর ফান অ্যান্ড প্লেজার। আর আমরা?

আলিয়ার গভীর চিন্তা বোধের জন্যই এত বেশি ভালো লাগে ঋষির তাকে। বলল, রাইট। তাহলে কাল ক্লাস শেষ হলেই।

—আমার তিনটে পাঁচ পর্যন্ত ক্লাস।

—আমার পঁয়তাল্লিশ।... বাই দ্য ওয়ে, তোকে কেন বললেন তোর নয়নিকা ম্যাডাম?

—ওই যে দাদাজির কেসটায় আমি তোকে অ্যাসিস্ট করেছিলাম, উনি জানেন। ওই জন্যই হয়তো। বললেন, আলিয়া তোমরা তো এসব ভালো বোঝ। ফেসবুক

সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো...। আমার বান্ধবী খুবই প্রবলেমে আছে। তুমি আর তোমার বন্ধু যদি একটু ওকে হেল্প করতে পারো, বাট খুব গোপনে। লোক জানাজানি যেন না হয়।

আর দাদাজির ওই কেসটার কথা তো আমরা সবাই জানি। খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল সবাই তোমার কাজের। তাই তোমাদের কথাই মনে হল...।

—ওঃকে, ওঃকে, ডান। এটা হয়তো আমাদের প্রথম ইনডিপেন্ডেন্ট কাজ হবে। উই উইল ট্রাই আওয়ার লেভেল বেস্ট। একটু উত্তেজিত ঋষি। উঠে বসেছে সে, বলল, লেটস্ মুভ দেন।

—আমার কিন্তু খুব এক্সাইটমেন্ট লাগছে। ভয়ও, পারব তো?

—মনে রাখবি তোর থেকে আমি সাহস পাই। বি কুল বেবি।

স্নিগ্ধ লাভণ্যময় মুখটার ওপর দিয়ে যে ঝড়ের তাণ্ডব চলছে তা এক বালক দেখেই অনুমান করতে পেরেছে আলিয়া ঋষি দুজনেই।

দরজা খুলে দিয়েই মুখে হাসি এঁকে, ‘এসো, এসো’ বলল লিজা।

এক নজরেই ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়েছে দুজনে। মধ্যবিত্তের বৈভব। বাড়াবাড়ি কিছু নেই। অধ্যাপকের বাড়ি বোঝা যায়। লিজা একটি বেতের সোফায় বসে ওদেরও নির্দেশ করল, বোসো ভাই তোমরা। দুজনেই আমার স্টুডেন্ট লাইক। কী বলব যে তোমাদের!... ভারী বিব্রত আমি।

লজ্জা বা সংকোচের ব্যাপারই বটে। ছাত্রছাত্রীর কাছে শিক্ষকের মানমর্যাদা অন্যরকম।

পরিবেশ হাল্কা সহজ করার জন্যই আলিয়া বলল, দিদি, আমি আপনার বোনের মতো। ঋষিও। আমাদের কাছে অস্বস্তির কিছু নেই। আপনি খুলে না বলে এই অপরাধগুলো হতেই থাকবে। আজকাল অনেক ক্রাইম হচ্ছে!

ঋষি ও সহজ আন্তরিকভাবে বলল, ‘প্লিজ বি ইজি। পুরো ব্যাপারটা আমাদের মনেই থাকবে। তবে আলটিমেটলি পুলিশের হেল্প লাগবেই। আপনার সম্মান যাতে ঠিক থাকে আমরা সেই দিকে খেয়াল রাখব।

লিজা যেন প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে তার মুখ দেখে বোঝা যায়।

ভেতরের ঘর থেকে কাশির খুক্খুক শব্দ পেয়ে

আলিয়া বলল, দিদি বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

—মা আর আমি। আর কাজের মহিলা। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন।

—আপনি বিয়ে করেননি তো?... আসলে আমরা কিছু প্রশ্ন করার হয়তো আপনার উত্তর দিতে খারাপ লাগবে কিন্তু না বললে আমাদের প্রবলেম সল্ভ করতে অসুবিধা হবে।

—না, বলব আমি।

—থ্যাঙ্কস দিদি।

—আপনি বিয়ে করেননি কেন? আই মিন না করার পেছনে বড় কোনও কারণ?

অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে যে লিজার মুখে চোখে নজর এড়াল না দুজনের।

আলিয়াই বলল, আচ্ছা থাক্, আপনি মেইন প্রবলেমটা বলুন। সবটুকু বলবেন, কিছুই বাদ দেবেন না।

ঋষি বলল, অ্যাকচুয়ালি, ইউ নো ম্যাডাম, ডাক্তারদের কাছে আর পুলিশ, ল'য়ারের কাছে সত্য গোপন করলে কাজ হয় না। তাই...। আপনি আমাদের প্রফেশনাল ভাবুন, তাহলে সব কিছু শেয়ার করতে পারবেন।

ছেলেমেয়ে দুটো তার ছাত্রছাত্রীর মতো হলেও এদের আচরণ অত্যন্ত সংযত ও প্রাপ্ত মনস্ক, মনে হচ্ছে লিজার। ভালো লাগছে।

বলল, জানো আলিয়া, ঋষি, আমার স্টুডেন্টসরা সবাই আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড। দে অল বিকেম মাই গুড ফ্রেন্ডস্। তাদের সঙ্গে আমি খুব ভালো সময় কাটাই। সো, তোমরা বড় হয়ে গেছ, হোয়াটেভার য়োর এজ উড বি, তোমরা এনাফ ম্যাচিওরড্। তাই...। কথা শেষ হওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেটেড হতেই লিজার মুখ যে বিবর্ণ হয়ে গেল তা দেখে আলিয়া ঋষির দিকে অর্থবহ তাকাতেই ঋষি ইঙ্গিত করল, ‘চুপ’।

লিজা ফোনটা তুলে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, হ্যালো!... হ্যালো! হ্যালো!’ তৃতীয়বার তার ‘হ্যালো’ বলার মধ্যে উত্তেজনা ঋষি। ভয়ার্ত তার মুখ। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে ঋষির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আর পারছি না।...কান্ট টেক দিজ এনি মোর... প্লিজ ডু সামথিং। প্লিজ—।

—ফোনটা কার? হু ইজ দ্য কলার?

ঋষির প্রশ্নের উত্তরে প্রায় কেঁদে ফেলেছে লিজা, বলল, জানি না... জানি না... প্রতিদিন দিন নেই রাত

নেই ফোন আসছে। কেউ কেউ আমার পরিচয় পেয়ে ‘স্যরি’ বলছে। বেশিরভাগই মেন্টালি সিক্। খারাপ প্রস্তাব দিচ্ছে। হাসাহাসি করছে। একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘নম্বর পেলেন কোথা থেকে?’ বলল, ‘একটা অ্যাডাল্ট সাইট থেকে। আপনার ছবি, আপনার নাম ফোন নম্বর দেওয়া আছে। কেন আপনি দেননি?’

বললাম, আমি একজন প্রফেসর। হাউ ক্যান আই ডু দিজ?’ সেই ছেলেটা বলল, স্যরি ম্যাম। ইউ স্যুড কনসাল্ট সাইবার পুলিশ।

ঋষির মুখ থমথম্ করছে। আলিয়া যে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ তার তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছে ঋষি। বলল, কুল ডাউন বেবি।

লিজার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ওপর একটু ভরসা রাখুন। আমার এবার যে যে নম্বরগুলো থেকে ফোন আসবে সেই নম্বরগুলো টুকে রাখবেন একটা ডায়েরিতে।

—আমি অলরেডি রেখেছি। প্রায় বারোটা চোদ্দোটা নম্বর থেকে ফোনগুলো আসছে। দু’তিনজন আমার পরিচয় দেওয়ার পর থেকে করেনি।

আলিয়া বলল, দিদি নম্বরগুলো দিন আমাকে।

লিজার হাতের মুঠোয় থাকা ফোনটা আবার কেঁপে বেজে উঠতেই আলিয়া দ্রুত ফোনটা লিজার হাত থেকে নিয়ে নিল।

—হ্যালো!

—হাই বেবি!

ইয়েস—

—হোয়েন ক্যান উই মিট সেক্সি? যু লুক ফ্যাব বেবি।

—সি যু অ্যাট পোলিশ স্টেশন, সমঝা? আর নহী সমঝা তো বহুৎ জলদি সমঝা যাওগে, যু বাস্টার্ড।

ফোনের সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে আলিয়া। মুখের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে তার। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে। ঋষিকে বলল, গুজরাটের নম্বর এটা। আমার এক ফুফি ওখানে থাকে। আমি জানি।

ফোন বাজছে আবার। আলিয়া ফোন তুলেছে আবার, ইয়েস!

—সেক্সি! ইতনা গুস্মা কিউঁ করতে হ্যায়? ফোন নম্বর, ফোটো নিয়ে আবার সতী সাজা হচ্ছে! তোমার মতো অমন অনেক সতী দেখেছি, বুঝেছ, মাল?' পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো বলল লোকটা।

—'লিসন ওয়ান থিঙ্ক। আমি নম্বর দিইনি। তোমার

মতো কোনও পারভার্ট আমার নম্বর দিয়েছে জাস্ট টু ম্যালাইন মাই স্ট্যাটাস। আর তুমি যদি ভদ্র হও, তাহলে আর কখনো ডিস্টার্ব করবে না। পুলিশ তোমার পেছনে আছে মনে রেখো।

কুৎসিত ভাবে হাসছে লোকটা। এত কুৎসিত সেই হাসি যে শরীর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে তার কদর্য বীভৎসতায়।

—ড্যাম শিট! বলে আলিয়া ফোনের সংযোগ ছিন্ন করল। লিজা আতঙ্কিত স্বরে বলল, দেখছ তো? দেখছ তো? রাত দুটো তিনটেতেও ফোন আসছে। ভয়ে ফোন ধরি না। সারারাত ঘুমাই না।

আলিয়া বলল, এইটাই কি মেইন প্রবলেম?

—নাহ!

—ফেসবুকে তার পাঠানো টেক্সটার মধ্যে এক ধরনের ভদ্রতা, সৌজন্য ছিল। তার ওপর তার ব্যক্তিত্ব। পাইলট। জার্মানি বেসড।

—তুমি যে বললে তুমি হাফ অ্যান আওয়ার বাদে অনলাইন হবে? তার আগেই তো অনলাইন ছিলে দেখলাম!

—চুপ! চুপ! শান্ত স্নেহশীল কণ্ঠস্বর দেবাশিসের। বলল, তুমি আমায় সন্দেহ করছ?

—না-তো। প্রশ্নটা এল তাই বললাম। যা সত্যি—।

—ওহ্ বেবি! আই লভ যু।

‘কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিল সে’ যেন!
লিজার হৃদস্পন্দন শুদ্ধ হয়ে গেছে যেন।

—বেবি! তুমি শুনছ? আই হ্যাভ আ স্ট্রং ফিলিংস
ফর যু জান বাচ্চা। তোমার মতো একটা কাউকে
খুঁজছিলাম এইরকম সিঙ্গেল বাট টেরিফিক বিউটি।
আমার বউ হবে?

অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরোল, গড!

—জান বাচ্চা! আমার?

—প্লিজ অন্য কিছু বলো।

—কেন? আমাকে তোমার পছন্দ না? বলো? দেন
আই উইল নেভার কামব্যাক। বলো।

দ্রুত টাইপ করছে লিজা, তোমার তো অনেক
গার্ল ফ্রেন্ড!

—তারা ফ্রেন্ডস্ ওনলি। নট গার্ল ফ্রেন্ডস্। আমি
সিঙ্গেল। হ্যাঁ, মেয়েরা, দে আর আফটার মি। আমি
ওসব মেয়েকে আমার দরজার বাইরে রাখি।
ডোরম্যাট। আমার লাইফে এন্ট্রি নেই। তোমার মুখটা
দেখেই আমার মনে হয়েছিল আমার স্ত্রী হতে পারে
এই একজনই। এখন তুমি না চাইলে ইটস্ আপ টু যু।

—তাহলে তোমার আইডি তে দেখাল কেন যে তুমি অনলাইন ছিলে?

—ছিলাম না। তুমি যন্ত্রকে বিশ্বাস করবে না আমাকে। শোনো, মানুষ যন্ত্র বানিয়েছে। যন্ত্র মানুষকে নয়। তাই তুমি কাকে বিশ্বাস করবে নিজেই ঠিক করো। বাই। আমায় বিশ্বাস করলে পরে নক্ক করো। ভেবেছিলাম আজ অনেক কিছু শেয়ার করব। থাক—।

—স্যরি স্যরি। বলো কী শেয়ার করতে চাও।

—আমার নাম আন্ড্রেই কেন জিজ্ঞেস করলে না তো? সব মেয়ে প্রথমেই এটা জিজ্ঞেস করে।

—আমি জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি।

—হা হা হা...ওড! এই জন্য তোমাকে আমার ভালো লাগে। লিসন্, আমার মা হলেন ব্রিটিশ। একেবারে রয়্যাল ফ্যামিলির মেয়ে। আমার বাবা ছিলেন ত্রিপুরার ছেলে। অল্প পড়াশোনা শিখেই লন্ডনে চলে গেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। এয়ারপোর্টে সুইপারের কাজ করতেন। তারপর পাশাপাশি লেখাপড়া শিখে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন ডিপ্লোমা নিয়ে। পরে হিথরো এয়ারপোর্টেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে ছিলেন। শেষ দিকে দেশে ফিরে আসেন। আর আমার মা ছিলেন এয়ারহোস্টেস।

—রয়্যাল ফ্যামিলির মেয়েকে কাজ করতে দিত
পরিবার?

—ইনটেলিজেন্ট কোয়েশেন। না দেয়নি। আমার
মা ক্যাথি ছিলেন ফ্রিডম লাভিং। মা বাড়ি ছেড়ে চলে
এসেছিলেন। চাকরি করতেন। একাই থাকতেন। পরে
বাবার সঙ্গে প্রেম। বিয়ে। তাই আমার দুটো নাম।

—তুমি...? তোমার জন্ম কোথায়?

—আমার জন্ম লন্ডনে। পরে ত্রিপুরায় চলে আসি।
তারপর আবার জার্মানি—। বিয়ে না করে এবার
দেশেই সেটল করব ভাবছি।

—কেন?

অনেক সুবিধা থাকলেও ওটা আমার দেশ নয়।
যদিও আমি সিটিজেন।... পরে আসছি। আবার নেক্সট
ফ্লাইট। বাই ডিয়ার। খেয়ে নিও। যত্ন নিও।

এত আনন্দ আমার জীবনে কখনো আসেনি বুঝলে
আলিয়া? আমার বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর
আমি খুব মন খারাপের দিন কাটাতাম। মাকে বিষণ্ণ
দেখতাম। আর আমিও তাই...। কলেজে সবাই যখন
প্রেম করে, ফান করে আমি তখন বাড়ি ফিরে
আসতাম মায়ের টানে। কারণ মা একা। তারপর ধরো
পাশটাশ করলাম। কলেজের চাকরিটাও পেলাম।
...কিছুদিন আগে একটা...! থাক্, সে কথা।

আলিয়া উত্তেজিত, বলল, না, বলুন। কিছুই বাদ দেবেন না। একই সঙ্গে বিষণ্ণতা ও ক্রোধ আলোছায়া হয়ে খেলা করে গেল লিজার মুখের ওপর।

আলিয়া আসছে সন্ধ্যাবেলা ঋষির সঙ্গে জানতেন সুপ্রিয়া, তাই আগে থেকেই আলিয়ার প্রিয় চিকেন মোমো আর নুডল্‌স স্যুপ বানিয়ে রেখেছেন।

আলিয়া আর ঋষি বাড়িতে ঢুকতেই জড়িয়ে ধরেছেন সুপ্রিয়া আলিয়াকে। বললেন, এতদিন পর আন্টিকে মনে পড়ল! যাঃ, খুব রাগ করেছি কিন্তু। ফোনও তো করতে পারিস মা একটা।

আলিয়া দ্রবীভূত, বলল, স্যারি আন্টি, আই মিস্‌ যু টু, আসক্‌ হিম। ওর কাছ থেকে তোমার সব খবর নিই আমি। তবে এটা ঠিক তোমাকে ফোন করা উচিত ছিল। প্রমিস এবার থেকে ফোন করব।

ঋষির দিকে প্রশ্ন করলেন সুপ্রিয়া, কোথাও গেছিলি?

—একটা কাজে, মা, খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও আগে।

হেসে ফেলেছেন সুপ্রিয়া, কেন সেখানে গেছিলি খাস্‌নি?

আলিয়াই ঋষি উত্তর দেওয়ার আগে বলল, 'হ্যাঁ
আন্টি, দিয়েছিল। বাট হজম হয়ে গেছে, হি-হি।

—তোর ফেবারিট সব বানিয়েছি।

—মোমো?

—ইয়েস।

—লভ যু আন্টি বলতে বলতে সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে
ধরে চতাস্ করে চুমু খেয়ে ফেলল আলিয়া। তারপরই
উদ্ভেজনার সঙ্গে বলল, জানো আন্টি, আমরা দুজনে
বড় একটা কেস সলভ করতে চলেছি।

—আবার খুনোখুনির মধ্যে জড়াস না বাবা!'
মুহূর্তে ভীত শঙ্কিত সুপ্রিয়া। বলল, কী দরকার তোদের
এসব করার। বাবা-মাদের ক্যাটেনসন হয়!

ঋষি ওপাশ থেকে মাথা নাড়ছে, যার অর্থ স্পষ্টই
হতাশাব্যঞ্জক। আলিয়া হেসে ফেলেছে ঋষির অবস্থা
দেখে।

সুপ্রিয়াকে আর কথা না বাড়াতে দেওয়ার জন্যই
সে বলল, মা আমি আর অলি আমার রুমে যাচ্ছি।
তুমি প্লিজ খেতে দাও।

আলিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই চোখ পাকাল ঋষি,
তুই ও দেখি মার মতোই পেটে কথা রাখতে পারিস
না! কী দরকার ছিল এখনই বলার?

—দেখ আমি মনে করি আমরা যে কাজগুলো করব সেগুলো অন্যায় বা অপরাধ নয়। যে বাড়ির লোকজনকে একটু জানালে অসুবিধা নেই। সত্যের বিকল্প নেই।

আলিয়ার সঙ্গে তর্কে কোনওদিনই পারেনি ঋষি। পারে না। তাই হেসে ফেলল, বলল, হয়েছে ম্যাডামজি। আপনার কাছে বাক্যযুদ্ধে আমি পরাজিত। হ্যাপি?

—হুম্। থ্যাঙ্কস্। যে আপনি বুঝতে পেরেছেন। এইবার আমরা খেতে খেতে রেকর্ডেড ম্যাটারটা আবার শুনব। ওকে?

—ডান। আমিও তাই ভাবছিলাম।

সুপ্রিয়া খাবার দিতে এসেও ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করলেন খানিকটা, তোরা এখন ক্যারিয়ার কর, এসব বুটকামেলায় জড়াস না নিজেদের।

—আন্টি একজন ম্যাম খুব বিপদে পড়েছেন। শী নিড্‌স আওয়ার হেল্প। তুমি কিন্তু চিন্তা করো না। তোমার ছেলেমেয়ের কিছু হবে না। ওংকে আন্টি?

সুপ্রিয়া সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টর উর্ধ্ব এখন বললেন, তোরা অনেক বুঝিস্। তবুও সাবধান—।

সুপ্রিয়া চলে যাওয়ার পরেই রেকর্ডার চালিয়ে দিল ঋষি।

আমার বান্ধবী স্বরূপার এক দূরসম্পর্কের দাদা, বুঝলে...? স্বরূপা খুব অসুস্থ হল একবার। খুব জ্বর, কাশি। কাশির সঙ্গে দমকে দমকে রক্ত। টিবি। ওকে দেখতে গেছি বাড়িতে... ওর ওই দাদা দীপকের চেনা। স্বরূপাই আলাপ করিয়ে দিল, আমার জেঠিমার বোনের ছেলে। দীপুদা বস্বেতে থাকত এতদিন। এই কয়েকমাস হল এখানে এসেছে। ওর মা খুব অসুস্থ, ক্যানসার... তাই। ...দীপুদাকে ও আমার পরিচয় দিল।

—তারপর?

—একদিন পরেই ছেলেকে ফোন করল বুঝলে? ওর নাকি আমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লেগেছে তাই বাড়িতে ইনভাইট করছে। ওর বোনের জন্মদিন।

—আচ্ছা...।

—আমি বললাম, হবে না, আমার কাজ আছে। বিজি। সে তো নাছোড়বান্দা। তারপর দেখি ফোনটা ওর মার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা বললেন, লিজা তোমার কথা মা অনেক শুনেছি স্বরূপার কাছে, আমার ছেলের কাছে। কাল তুমি আসলে তোমার এই মাসি খুব খুশি হবে। তুমি আসছ তো?’ অগত্যা

গেলাম। স্বরূপাকেও জানালাম আমার অস্বস্তির কথা।
ও বলল, যা না, দাদা খুব ইন্টেলেকচুয়াল প্রকৃতির।
তোর ভালো লাগবে। তুই তো মিশিসইনি কারো
সঙ্গে। যা। ও তোর কথা বলছিল খুব। ...আমি...।’

রেকর্ডার পজ্ মোড-এ দিয়ে দিল আলিয়া, বলল,
দ্যাট পার্সন স্যুড বি ইন আওয়ার ভিজিলেন্স। নামটা
নোট ডাউন করে রাখি।

—রাইট। আমি লিখছি। ‘দীপক’।... বাট দীপক
কী? সারনেম?

—ম্যাডাম একবারই ফুলনেম উচ্চারণ করেছিল,
দীপক দাশগুপ্ত।

রেকর্ডার অন করেছে আলিয়া।

‘খুব ভালো রিসেপশন পেলাম বুঝলে? আমার
যেটুকু আনইজিনেস ছিল কেটে গেছিল।

বাট কিছুদিন পর থেকে বুঝতে শুরু করলাম...।

—এটা সিনেমা হল! প্লিজ!

—হোক, খোলো, তুমি নিজে খোলো। জাস্ট দুটো
বোতাম। আর এবার থেকে সালোয়ার কামিজ নয়,
শাড়ি পরে আসবে সিনেমা হল-এ।

—আমি পারব না।... আহ! ছাড়ো...।

কাতর অনুনয় করল দীপক, তুমি তো জানো

লিজা, আমি তোমাকে দেখলেই এক্সাইটেড হয়ে যাই। এটাকে অনার করো প্লিজ। আমার বউ তুমি, অন্য কোনও মাগীর বুকে তো হাত দিতে যাচ্ছি না।

—তোমার বাক্ সংযম করা উচিত। এ কী ভাষা!

হে হে করে কেমন হাসল দীপক। হাসির মধ্যে যে অশালীনতার রস মিশে থাকে প্রত্যক্ষ করে ঘৃণায় সঙ্কুচিত লিজা। বলল, এটা সিনেমা হল।

লিজার বুকে পেটে হাত খেলা করছে দীপকের। কুৎসিত তেলাপোকার স্পর্শের মতো অনুভূতি হচ্ছে লিজার।

—ভালো লাগছে না?

—না।

—ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে যাবে তো?

—সিনেমাটা দেখতে দাও, প্লিজ।

—না, আমি সিনেমা দেখতে আসিনি। তোমায় খেতে এসেছি।

—ছিঃ।

সিনেমার মাঝপথেই উঠে পড়েছে দীপক। হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল লিজাকে।

বিরক্ত, মহা বিরক্ত লিজা।

—কী হচ্ছে কী?

—বাড়ি যাব চলো। আমি তো তোমাকেই বেশি করে কাছে পেতে চাই নিজা। প্লিজ, না কোরো না। পাঁচদিন স্টারভিং আছি। সিনেমা হলে বসে সময় নষ্ট করে শালা কোন্ চার অক্ষরের বোকা?

—ছিঃ! এত খারাপ তোমার মুখের ভাষা! ছি!

হে হে করে হাসছে দীপক।

শুনশান বাড়ি। দোতলা বাড়িটার কোনও ঘরেই আজ আলো জ্বলেনি।

একতলায় পা দিয়েই চমকে উঠেছে নিজা। কেউ নেই? লাইট জ্বলছে না!

—না, মা টেক্সট করেছিল মাসির বাড়িতে যাচ্ছে। মেসো হসপিটালাইজড হয়েছে। আজ হয়তো ফিরবে না।

—দীপ্তি মাসি?

—দীপ্তি হয়তো ঘুমোচ্ছে! ও তো আবার আমায় ভয় পায়! হে হে হে...।

সিঁড়ির লাইট জ্বলেছে দীপক, এসো।

—দীপ্তিদি ভয় পায় কেন?

—ওকে একবার ট্রাই করেছিলাম... হে হে... তখন অবশ্য আমি অনেক ছোট। মাত্র টুয়েল্ভ ক্লাস।

—কী? কী বললে? ছি ছি ছি! মেড সার্ভেন্টকেও তুমি...! আমি বাড়ি যাব।’

হন্ হন্ করে নেমে এসেছে লিজা সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। দ্রুত ধরে ফেলেছে দীপক তাকে। এক হ্যাঁচকায় বুকের কাছে টেনে এনেছে। ‘প্লিজ! প্লিজ সোনামণি। আমার মতো ছেলের ওপর কেউ রাগ করে? আমি তো তোমায় নাও বলতে পারতাম! তুমি তো জানতে পারতে না সোনা। হামি দাও। চুমু দাও। দাও—। দাও বলছি। তুমি আমায় না বুঝলে আমি সুইসাইড করব। দেখো, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।’

লিজার ঘাড়ে মুখে ঠোঁটে প্রবল আশ্লেষে চুমু খাচ্ছে দীপক। বলল, আমার অবস্থা টের পাচ্ছ সোনা? প্লিজ!

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে লিজা। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রায় ঝড়ের গতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় পৌঁছতেই অপেক্ষারত একটি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল নিমেষে।

পেছন পেছন দৌড়ে এসেও দেখতে পায়নি দীপক। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিস্ত্রী একটা গালি দিয়ে ফোন করল।

ট্যাক্সি চলেছে। দু চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে

লিজার। শরীর কাঁপছে থরথর করে। মনের মধ্যে একটাই শব্দ সমস্ত তন্ত্রী ছিঁড়ে উঠে আসছে, ছি ছি ছি! লম্পট! লম্পট! আর না। আর না...

ফোন বাজছে লিজার। দীপক কলিং। কেটে দিল ফোনের লাইন। আবার ফোন বাজছে। ফোনের সুইচ অফ করে দিয়েছে লিজা। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর কোনওরকম সম্পর্ক সংযোগ নয়। এরপর পরিষ্কার জানিয়ে দেবে সে তার সিদ্ধান্ত।

রেকর্ডার অফ করেছে আলিয়া। ঋষি সপ্রশ্ন তাকাল।

—তুই কি মনে করিস দীপক আর আন্দ্রেই দেবাশিস একই ব্যক্তিত্ব?

—এখনো কোনও সিদ্ধান্তেই আসিনি। র‍্যাদার নেভার থট অফ। কেন বললি?

—জাস্ট আসকিং। পয়েন্টগুলো কি তুই নোট ডাউন করছিস্? একেকটা টার্নিং পয়েন্ট একেকটা সোর্স কিন্তু —।

—আই নো মিস ডিটেকটিভ। হেসে ফেলেছে ঋষি। আমি নোটডাউন করেছি। নাই সুইচ অন দ্য রেকর্ডার।

বাথরুমে আজ সময় থমকে গেছিল যেন! অবিশ্রান্ত

বারিধারাও যেন শরীরে লেপ্টে থাকা অবাস্তিত ময়লাকে ধুয়ে মুছে সাফ করতে পারছে না। কান্না আসছে শুধু পেটের ভেতর থেকে গুলিয়ে গুলিয়ে। কাঁদছে লিজা। আর মস্তিষ্কের দেওয়ালে দেওয়ালে আঘাত করছে একটাই শব্দ, ‘ছিঃ ছিঃ কী ভুল! কী ভুল!’

কত রাত হবে? দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল লিজার। সাড়ে এগারোটাই!

মোবাইল অন করতেই আছড়ে পড়ল মিস্‌ড কল মেসেজ।? আর ফোন এল সঙ্গে সঙ্গেই।

আরতি দাশগুপ্ত কলিং! দীপকের মা! লহমায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে। কথা বলবে দীপকের মায়ের সঙ্গে। জানিয়ে দেবে তার সিদ্ধান্ত।

—হ্যাঁ বলুন।

—কী হয়েছে তোমাদের? লিজা?

—‘মান অভিমান কিছু নয়। আপনার ছেলে যে এত পারভার্ট আমার জানা ছিল না!’ উদ্বেজনা কণ্ঠস্বর কাঁপছে তার। ‘শুনুন, আপনার ছেলেকে বলে দেবেন সে যেন আমার সঙ্গে আর কোনওরকম যোগাযোগের চেষ্টা না করে।

—কেন রে মা? আমায় বল কী হয়েছে? তোমায়

পেয়ে এই বুড়ো মা-টা অনেক শান্তি পেয়েছিল, জানিস তো? মনে হয়েছিল একটা শত্রু সুন্দর কাঁধ পেলাম যে আমার ভাঙাচোরা সংসারটাকে গড়ে তুলতে পারবে। অদৃষ্ট!

—স্যরি! আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি উপায়হীন। আপনার সঙ্গে আমার ফোনে কথাবার্তা হতে পারে। আমি আপনার খোঁজখবর নেব। কিন্তু আর অন্য কোনও সম্পর্ক নয়। ফাইনাল।

স্পষ্টতই ভেঙে পড়া কণ্ঠস্বর আরতি দাশগুপ্তর। ফোনের ও প্রান্তে নিঃশব্দ তিনি।

—আমি রাখছি।

—না, মা না। আমাকে বল কী সমস্যা হল। আমি তো সলভ করতে পারি।

—আপনি পারবেন না। আপনার চল্লিশ বছর বয়সের পারভার্ট ছেলেকে চরিত্রবান করে তুলতে পারবেন না আপনি। খারাপ লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে একটি চূড়ান্ত পারভার্ট। এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি রাখছি। আরতি দাশগুপ্তাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনের সংযোগ ছিন্ন করল লিজা।

এতক্ষণে যেন মন শান্ত হল তার। যাবতীয় ক্রোধ ক্ষোভ উপড়ে দিতে পেরে মন এখন হাল্কা অনেকটা। যদিও ঝড় এখানেই থামবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত সে। এর আগেও দু-তিনবার হাতে পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল দীপক। সেই ব্যাপারে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে লিজার আজ। কেমন হু হু শূন্য অনুভূতি বুকের ভেতর। বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটা তুলে নিল হাতে। সুইচ অন করল। আশিটা মিসড কল দীপকের। আরতি দেবীর দুটো!

দীপক মেসেজ লিখেছে, ‘আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করতে পারো না। আমি তোমাকে আমার সব সত্যি বলতে চাই। তা যদি অন্যায় হয় তাহলে তুমি যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিও। অন্তত একবার এসো ফিরে। ‘মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।’

চোয়াল দৃঢ় হল লিজার। দাঁতে দাঁত ঘষে গেল। চোখ জ্বালা করে উঠল এইমাত্র। ‘নাহ! আর না। এনাফ!’

—তুমি একটু রঙটঙ করতে পারো না? থিক্ থিক্ করে হাসছে দীপক।

—মানে?

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছে দীপক। এই দুপুর বড় নির্জন। ছুটির দুপুর। গ্রীষ্ম ঋতু।

দুপুরে এ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরেছে দীপক আর আরতিদেবীর সঙ্গে। আরতি খাওয়ার পর বললেন, আমি একটু বিশ্রামে যাই। তোমরা গল্প করো।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুপুর। ঘরময় ছেয়ে আছে গান ‘ভালোবাসি ভালোবাসি...।’

মন ভরে যাচ্ছে লিজার। তার মাথোই পরনের পাঞ্জাবিটা ছাড়তে ছাড়তে দীপক বলল, মানে আবার কী? খিদিরপুরে আমার জন্য একটা মাগী আছে, বুঝলে তো? হে হে...। বজ্রপাত হল যেন ঘরের মধ্যে।

শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরে তার পাশে এসে বসেছে দীপক। হাসছে। বলল, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে গেছিলাম খিদিরপুরে প্রস কোয়ার্টারে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে লিজার। ‘এ কে? কার সঙ্গে তার সম্পর্ক হল? কার সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলে সে নির্ঘুম রাত কাটায়?’

জড়িয়ে ধরেছে দীপক তাকে। দীপকের জিভ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার ঘাড় গলা বাহু। ঘৃণায় কুঁকরে উঠে সে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল দীপককে। বলল, ছি ছি!

—ছি ছি কী? পুরুষ মানুষের আবার চরিত্র হয় না কি? মেয়েটা জানো তো হেবি সেক্সি! ঢঙ যা জানত! আমায় কিছু করতে হত না। ওই সব করে দিত! কয়েকবার গেছিলাম। ভদ্রলোকের মেয়েরা শালা কিস্যু পারে না! সতীসাবিত্রী! এসো, কাছে এসো।

ঘৃণায় ছিটকে গেছে লিজা। নিজের শরীরকেই যেন ঘেন্না করতে ইচ্ছা করছে।

—তুমি! তুমি!

—হে হে আমি ভাই তোমাকে কিছু লুকাব না ঠিক করেছি। রাগ করছ কেন? সে তো অনেকদিনের ঘটনা। তখন তো সব সময়েই হট হয়ে আছি। মেয়েদের ব্লাউজ পেটিকোট দেখলেই... হে হে...। আমি তো ড্রাগস্ও নিয়েছি মেয়েটার থেকে!

হতবাক! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! হতবাক হয়ে দেখছে লিজা দ্বিপদ এক শষ্যতানকে যেন!

—এক বছর লস্ হল। ড্রাগ নিতে গিয়ে...।

হতবাক হতে হতে কোনও এক পর্বে কে যেন

সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে তুলল, যাও নিজা।
যাও—। যাও—।

দীপককে হতচকিত করে দিয়ে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ঘর
ছেড়ে বেরিয়ে গেল নিজা।

আলিয়ার মুখ চোখে ক্রোধের তাপ। ঋষির দিকে
তাকাল, বলল, আ রিয়েল পারভার্ট। শয়তান! ওই
লোকটার ফোন নম্বর লাগবে, বুঝলি?

ঘাড় নাড়ল, ঋষি, হ্যাঁ।

—তোর কি মনে হয় কোথাও আন্দ্রেই দেবানিসের
সঙ্গে এই লোকটার কানেকশন আছে? না কি দুটো
ঘটনা ডিফারেন্ট?

—এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। এখনই কোনও
কনক্লুসানে আসা ঠিক হবে না বোধহয়।

মাথা নাড়ল আলিয়া।

—মাকে একটা ফোন করে দিই বুঝলি? আজই
পুরোটা শুনে যাব একসঙ্গে।

—আমি তোকে কপি করে দিতে পারি। সেটা
দরকারও। তুই তো তোর মতো প্রসিড করবি। আমি
আমার মতো। তারপর দুজনে একসঙ্গে বসে
অ্যানালিসিস করে একটা কনক্লুসানে আসব।

—তাহলেও প্রথমে একসঙ্গে শোনাই ভালো।

—একদম।

ফোন করে নিশ্চিত এখন আলিয়া। মুখে চোখের টেনশনের ভাব কেটে গেছে। বলল, মমকে টেনসন ফ্রি করে রাখলে নিশ্চিত কাজটা করা যায়। লেটস্ স্টার্ট—।

—কী হয়েছে লিজা? কী হয়েছে রে মা?

—কিছু না তো—। গলা দিয়ে খাবার নামছে না। কেমন সব ঠেলে উঠে আসতে চাইছে।

—তাহলে খাচ্ছিস না যে? তোর ফেবারিট উপমা বানালাম আর—!

সারা শরীরে এত বিরক্তি কেন? ঝাঁজিয়ে উঠল সে, রোজ কি শরীর মন একরকম থাকে না কি?

স্বভাবশাস্ত্র মেয়ের মেজাজ হারানোর ঘটনা কিছু ইঙ্গিত করে বৈকি। তাই খতমতো খেয়ে গেলেন লীলা। এই মেয়েকে তিনি জানেন। এতটাই চাপা প্রকৃতির যে যে কোনও রক্তক্ষরণ নিঃশব্দে সহ্য করতে পারে। তাই তিনি নিজে অসহিষ্ণু না হয়ে বললেন, আচ্ছা যখন ইচ্ছে হবে খেয়ে নিস্।

মোবাইল থেকে বার বার দেখছে ফেসবুক, লিজা। নাহ্! দেবশিস অনলাইন ছিল আঠারো ঘণ্টা আগে!

এমনটা হওয়ার তো কথা নয়! যে মানুষটা ফ্লাইট টেক অফ করার আগে, ল্যান্ডিংয়ের পরপরই ফেসবুকে অনলাইন হয় শুধু তার জন্য সেই মানুষটা একেবারে হাওয়া! তাহলে কি কোনও বিপদ?

ভাবতেই গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেল লিজার। দেবাশিস একটা ফোন নম্বর দিয়েছিল বটে কিন্তু কখনো ফোন করার দরকার হয়নি আজ পর্যন্ত।

দেবাশিসই বলেছিল, নম্বরটা নিয়ে রাখো আমার একেবারে পার্সোনাল নম্বর। তবে আমরা কেউ কাউকে ফোন করব না এখন।

‘কেন?’

আমি তোমার চেহারা দেখে দেখে কল্পনা করি তোমার ভয়েসটা কেমন হবে। জানো আমি খুব ইমাজিনেটিভ তোমার ছবি দেখে দেখে একমাস ধরে শুধু কল্পনার জগতে ছিলাম। তুমি এইরকম হবে... তুমি ওইরকম হবে। তুমি এমন করে শোও, বসো, হাঁটো... আমার নিজের মতো কল্পনা!...তোমার কণ্ঠস্বর যে খুব সুইট আর সেক্সি আমার তা মনে হয়।’

ভেতরে ভেতরে আনন্দ ঢেউ অনুভব করে লিজা। চ্যাট বক্সে লেখে, ‘তবে তাই হোক।’

বিছানায় এপাশ ওপাশ করল অনেকক্ষণ লিজা।
 বারবার দেবাশিসের প্রোফাইলে উঁকি দিচ্ছে। এখন
 আর ঘণ্টা সময় দেখাচ্ছে না। শুধু ‘মোবাইল অন
 লাইন’ দেখাচ্ছে। সময় এগোচ্ছে। ‘লাস্ট অন লাইন
 ইয়েস্টারডে’ দেখাচ্ছে মোবাইল।

সংযম অতিক্রম করল লিজা। ফোন না করলেই
 নয়। তাতে দেবাশিসের ইমাজিনেশন নষ্ট হয় তো
 হোক্।

‘সুইচড্ অফ’! হতাশ আর টেনসন চরম পর্যায়ে
 লিজার। তাহলে কি সত্যি কোমও দুর্ঘটনা?
 দেবাশিসের কোনও পরিচিত বন্ধু স্বাক্ষরের সঙ্গে তার
 আলাপ নেই যে খবর নেওয়া যাবে।

প্রতীক্ষা! প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষার পালা। ভয়ংকর
 মুহূর্ত! লীলা দুপুরের দিকে একবার ঘরের দরজার
 সামনে দাঁড়িয়েই বললেন, কলেজে গেলি না!

—মা, আমার এক ফেসবুক বন্ধুর খোঁজ পাচ্ছি
 না!’ কেমন সহায় সম্বলহীনের মতো কণ্ঠস্বর তার।

লীলা অবাক। এমনভাবে কারোর জন্য তো
 মেয়েকে কখনো উদগ্রীব হতে দেখেননি এর আগে!
 বললেন, ফেসবুক বন্ধু? ছেলে না মেয়ে?

অসহায় চোখ মেলে তাকাল লিজা। মায়ের সঙ্গেই

সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়া তার। বলল, একজন পাইলট মা। এদেশে থাকেও না। জার্মানিতে—। প্রতিদিন কথা হয়। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল...! কোনও খবর নেই!

—ফোন?

—করেছি। বন্ধ।

—অপেক্ষা করো। প্লেনের ব্যাপার। হয়তো দূরে কোথাও গেছে! মায়ের কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে লিজার। মনের মিল, নিশ্চয়ই তাই হবে। নিশ্চয়ই—।

একটু বেশি রাতের দিকে জ্বলে উঠল সবুজ আলো। ধক্ করে উঠেছে লিজার হৃদপিণ্ড।

তার কিছু লেখার আগেই দেবাশিসের বার্তা ভেসে উঠল, ‘হাই! সুইটহার্ট!’

‘কোথায় তুমি?’

‘স্যরি বেবি।’

‘হাউ ক্যান আই ফরগিভ যু? তুমি জানো আমার অবস্থা।’

‘জানি বেবি। মাই বেবি। একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম। এখানে প্রচণ্ড তুষার ঝড় হচ্ছিল। তাই

উড়ান বন্ধ। নো নেটওয়ার্ক। আমার কি মন উতলা হচ্ছিল না?’

‘তোমায় ফোন করেছিলাম। বন্ধ।’

‘হোয়াই? কেন? বারণ করেছিলাম না? যাও, আর কথা বলব না। অফ হলাম।’

সবুজ আলো অদৃশ্য। নিমেষে অদৃশ্য। হতবাক লিজা। এ কীরকম মানুষ? এত রাগ?

‘তোমার ইমাজিনেশন নষ্ট হয়ে যাওয়ার চাইতেও কি আমার টেনশন বড় নয়? তোমার বিপদ চিন্তা করে অপারগ হয়েই কল করেছিলাম। আর তুমি আমার ওপর রাগ করলে!’

উত্তর এল না।

‘আমরা দু’জনে অনেক দূরে থাকি। তাই রাগারাগি করে সময় নষ্ট করে কী লাভ বলো?’

‘আমার মন খারাপের কোনও মূল্য নেই?’

রাগ হচ্ছে মানুষটার ওপর লিজার। খুব রাগ। রাত ভোর হয়ে গেল দেবাশিস আর অনলাইন হল না।

তবু কোথাও একটা নিশ্চিত্ত বোধ করল সে, যাক্ মানুষটার বিপদ হয়নি কোনও।

সকালে লীলা একবার জিজ্ঞেস করলেন, খোঁজ পেলি?

—হ্যাঁ মা। তুষার ঝড় হচ্ছিল ওখানে। নেটওয়ার্ক ছিল না।

—তবে ফেসবুক-টুক আমি অত বুঝি না, তাও মনে হয় কোনও মানুষকে দেখে না চিনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব না করাই ভালো।

সন্দেহ! সন্দেহ করবে সে? দেবাশিসকে? তা হতেই পারে না। দেবাশিসের প্রোফাইল তখনই করে জেনেছে সে। বিশেষত পূর্ণিমাটির ঘটনার পর যখন দেবাশিসের সঙ্গে প্রথম আলাপ, আলাপ ঘনিষ্ঠতার দিকে মোড় নিচ্ছে তখন মনের কোণে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল বটে। পূর্ণিমার ঘটনা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল।

কিন্তু দেবাশিসের প্রোফাইলে সন্দেহজনক কিছুই পায়নি সে। বরং সে যে গতবছর দিল্লিতে এসেছিল, ময়ূরবিহারে ছিল, এবং তার এক ফেসবুক বান্ধবীর সঙ্গে দিল্লিতে দেখাও হয়েছিল তার, ছবিও আছে! অর্থাৎ মানুষটা ভুলো নয়। এরপর আর কী সন্দেহ করার থাকতে পারে? তাহলে তা সন্দেহ রোগে পরিণতো হয়ে যাবে এই সন্দেহ!

আজ আপন কল্পনার জগতেই বসবাস করল সে। তার ভাবনা চিন্তাগুলো ছিল এইরকম, সব মানুষের

চরিত্র এক রকমের হয়? হয় না। হাতের পাঁচটা আঙুলও সমান হয় না। আর অমন একজন কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক মানুষ! তার মনে আঘাত লাগতেই পারে। সে তো আমার সঙ্গেই শুধু কথা বলে! তুষার ঝড়ের ধাক্কা সামলে এসে আমাকেই তো প্রথম টেক্সট করল! সে যদি খারাপই হবে তাহলে আমার সঙ্গে কথা না বলে অন্যদের সঙ্গেও চ্যাট করতে পারত। করেনি তো? সো অফলাইন হয়ে গেল!

মন খারাপ! মন খারাপ লিজার।

সে টেক্সট করল, ‘স্যরি, স্যরি। আমি হবে না।’

কলেজ ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকেও দেখে নিয়েছে সে ফেসবুক। না, দেবশিস অফলাইন। সবুজ আলো জ্বলেনি। বাংলার মহামিতাদি, একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী ব্যাপার লিজা? এনি প্রবলেম? মুখটা শুকনো!

নিজের অভিব্যক্তি দ্রুত পরিবর্তন করেছিল সে, না তো। ও হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর খবর পাচ্ছি না তাই—।

মহামিতোদি সিরিয়াস ধরনের মানুষ, তাই তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির, বললেন ওহ! তাহলে তো চিন্তার বিষয়। তবে আজকের এই টেকনোলজির যুগে

খবর পেতে সময় লাগে না। চিন্তা করো না।

বেলা দুটোর দিকে ধক্ করে উঠেছে তার বুক।
সবুজ আলো জ্বলছে।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্তা ভেসে এল লিখিত
হয়ে, ‘কী করছ?’

‘তেমন কিছু না।’

‘কেন কিছু করছ না? আমার কথাও চিন্তা করছ
না?’

অভিমানের পাহাড় যেন ধসে পড়ল। কান্না ভাঙছে
বুকের ভেতর। শব্দ পাচ্ছে সে। যেহেতু ক্লাসরুম, তাই
কীভাবে যে জলপ্রপাতের ধারায় বয়ে যাওয়াকে
প্রতিহত করল সে!

ছাত্রছাত্রীদের থেকে ‘এক মিনিট আসছি’ বলে
বেরিয়ে এসেছে সে ক্লাসরুম থেকে। টয়লেটে এসে
চোখের জল ধুয়ে নিল কলের জলে।

দেবাশিস লিখেছে, ‘কী হল? রাগ? চুপ কেন?’

মুখচোখ মুছে সে লিখল, ‘কতটা চিন্তা করলে
আমার মতো মানুষ তোমার বারণ অমান্য করে ফোন
করে ভেবে দেখেছ?’

‘স্যরি জান। বলো কী করছ?’

‘ক্লাসে আছি।’

‘আমার কথা ভাবছ না?’

‘হঁ।’

‘গুড গার্ল।’

‘তোমার ওখানে এখন কটা বাজে?’

‘সন্ধে। আমি ক্লাবে বসে আছি। বিয়ার খাচ্ছি আর আমার জান-টার কথা ভাবছি।

কী এক অপূর্ব ভালোলাগার অনুভূতি স্রোতে স্রোতে তট ছুঁয়ে যাচ্ছে।

‘জান, আমি আর তোমাকে না দেখে থাকতে পারছি না। আমি আসছি।’

‘কবে? কবে আসছ?’

‘ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছি।’

‘কবে বলো?’

‘বলব। ওয়েট। এখন যাই। ফ্লাইট আছে। জানো একটা এয়ারহোস্টেস আমার প্রেমে একেবারে উন্মাদ! হা হা হা...।

‘ভালো তো। তাকে ফিরিয়ে না।’

‘ছিঃ! তুমি অমন কথা বলতে পারলে? আমি তো তোমায় সব বলি। আমার হৃদয় যে আর ফাঁকা নেই! চোখ না বুজেও তোমার মুখটাই শুধু দেখতে পাই! তুমি যে আমার কী করলে জান! ওঃ কে বাই, সি ইউ।

আসছে সে আসছে। হৃদপিণ্ডের উপস্থিতি প্রচণ্ডভাবে বুঝতে পারছে সে। তাহলে কি এই ভালোবাসা? ভালোবাসা? প্রেম!

লং জ্যাকেটে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে লিজা। দৃশ্যগুলো খণ্ডিত। সে গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে আল্লসের পথ দিয়ে! কখনো তুষারপাত... কখনো সবুজে ঢাকা বনভূমি...সে আর দেবাশিস! আন্দ্রেই দেবাশিস সরকার উড়ানে যাচ্ছে। ফ্লাইট থেকে নেমেই অপেক্ষারত তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাচ্ছে, জান! লভ যু। লভ যু...।’

হাসল আলিয়া আর ঋষি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আলিয়াই বলল, লন্ডন ইজ সামথিং যু কান্ট ডিফাইন...আর এই ডিভাইন ফিলিংসটা নিয়ে কত ক্রাইম করে মানুষ! ‘মেয়েরা বেশি ভালোবাসে।

‘দিস ইজ নট ট্রু। ছেলেরাই।

—নো ঋষি। মেয়েরাই তো প্রতারিত হয়ে থাকে। তুমি দেখো মেয়েরা যে সবচেয়ে খারাপ... আই মিন ফ্লেশের ব্যবসার নামে তাও তো ছেলেরা বিক্রি করে দেয় বলেই; অধিকাংশ তাই। প্রেম করে বিয়ে করবে বলে বোকা মেয়েগুলোকে এনে সেল করে দেয়! অন্যভাবেও আসে। তবে এভাবেই বেশি।

—হয়তো! তবে সব ছেলে তো এমন নয়।

—তা কেন? হাসল আলিয়া। লেটস্...।

রাত দুটোর দিকে মেসেজ এল দেবশিসের, ‘হাই জান!’

‘বলো’।

‘ঘুমাওনি?’

‘না।’

‘আমার জন্য?’

‘হুঁ।’

‘আজ পর্যন্ত লভ যু বলোনি কিছু।’

‘কী করছ?’

‘সে লভ যু।’

‘বলব—’

‘এখনই চাই শুনতে।’

‘বলছি তো বলব।’

‘নাউ। এখুনি—’

বুকের ভেতর আশঙ্কার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে লিজা। আবার না রাগ করে চলে যায় মানুষটা। ‘লভ যু।’ হাত কেঁপে গেল লিখতে গিয়ে। মুখ লাল হল।

‘ওহ জান! জান আমার! লভ যু লভ যু...লভ

যু...কিস যু...। আয়্যাম দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান নাউ। লভ যু জান।

‘কবে আসছ?’

‘যদি বলি আজ আর তিনঘণ্টা পর আমার ফ্লাইট টু বম্বে? ওখান থেকে সরাসরি কলকাতায়। কলকাতায় বিশেষ একটা কাজ আছে। কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা স্টেট করে ত্রিপুরা। আমার এক বিধবা পিসি আছে, পিসির কাছে উঠব। ওখানে দু’দিন থেকে কলকাতায় আসব আমার জানমণিটার সঙ্গে দেখা করতে।’

উত্তেজনার আনন্দে হাত কাঁপছে। লিখবে কি সে? কত কথা! অনেক কথার বহিঃপ্রকাশ হল শুধু, ‘সো হ্যাপি!’

‘বাই জান। সি যু সুন। জান তোমার একটা ফুল ন্যুড পিকচার পাঠাবে? এখনই। আই ওয়ান্ট টু সি যু। প্লিজ, না করো না।’

হতবাক লিজা। এ কী ধরনের আবদার? কোনও ভদ্রলোক পারে না কি এই কথা বলতে?

‘জান, আমার কি তোমাকে দেখার রাইট নেই? বলো? তুমি তো আমার, না কি? প্লিজ সেন্ড। ওঃ কে, ব্রা পরা একটা পিকচার অন্তত—।’

‘আমাকে এমন কিছু করতে বোলো না যা আমি

করতে পারব না। প্লিজ। তুমি তোমার অন্য বান্ধবীদের বলো, ওরা দেবে। ওরা যা ফ্ল্যাট করে তোমার সঙ্গে!

‘ওদের তো আমার চাই না। আমি আমার বউকে চাই। প্লিজ—’

‘নো।’

‘ওঃ কে, বাই।’

‘স্কাউন্ডেল!’ রাগে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে আলিয়া। ‘যু নো ঋষি, জাস্ট আই ওয়ান্ট টু কিল হিম। আই উইল পানিশ হিম। আই উইল।’

বিছানায় রেকর্ডারের পাশে রাখা মোবাইলে ‘লিজা ম্যাম কলিং’ বাজছে দেখে দ্রুত ফোন রিসিভ করল আলিয়া।

—আলিয়া! আমি আর পারছি না জানো! সেভ মি। আলিয়াকে কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ দিল না লিজা, বলল, তোমরা চলে আসার পর থেকে বারোবার ফোন এসেছে আমার কাছে! বারোবার! বারোবার! কান্না দমন করতে পারছে না লিজা। কেঁদে ফেলেছে, বলল, কখনো কেউ একা, কখনো একসঙ্গে তিনচারজন মিলে...হরবল্!

—নম্বরগুলো মেসেজ করে দিও প্লিজ। আর

আননোন নম্বর হলে ফোন ধোরো দিদি। শুধু নম্বরগুলো মেসেজ করে দিও। ডোন্ট ওরি দি। আমরা পাশে আছি।... বাই দ্য ওয়ে ওই দীপক লোকটার ফোন নম্বরটা দাও। আর ওঁর অ্যাড্রেস। মেসেজ করো। বাই।

—কী?

ঋষির প্রশ্নের উত্তরে আলিয়া থমথমে মুখে বলল, আই থিঙ্ক একটা চক্র কাজ করছে। ফোন আসছে অনেক।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস দীপক আর দেবাশিস সেন্ট পার্সোনালিটি। তুই দেখ্ দুজনেরই নাম শুরু হয়েছে ‘ডি’ দিয়ে। অপরাধীরা সাধারণত কিছু কখন ভুল করে এক্ষেত্রেও তাই। দীপক রিজেকটেড হওয়ার পরই দেবাশিসের আগমন ফেসবুকে। লিজা ম্যামের ছবি দিয়ে ভুয়ো আইডি খোলা এস্‌সেটরা, এগুলো কিন্তু সবই দীপকের সঙ্গে ব্রেকআপ-এর পর! লিজা ম্যামকে ব্ল্যাকমেল করা, তার চরিত্র নষ্ট করা, রেসপেক্ট নষ্ট করাই মূল উদ্দেশ্য।

—এত তাড়াতাড়ি তুই ডিসিশনে এলি কী করে?

—তুই কি ডিফার করছিস?

—কমপ্লিকেটেড।

মোবাইলে পাঠানো ফোন নম্বরগুলো নোট করে নিয়েছে আলিয়া ইতিমধ্যে। সেগুলো দেখতে দেখতে বলল, দেশের কোনও স্টেট আর বাকি নেই দেখছি! বম্বে, দিল্লি, গুজরাট, ইউপি, এমপি সব—!

—যে সাইটে ম্যাম-এর পিকচার আর ফোন নম্বর পোস্ট করা হয়েছে সেগুলো একবার চেক করতে হবে আর বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে ওঁর কোনও পরিচিত যদি কেউ দেখে ফেলে খুবই বাজে ব্যাপার হবে।

—ইয়েস।

রেকর্ডার বন্ধ করে ল্যাপটপ আন করল ঋষি। সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়ল দুটো সাইট। চমকে গেছে রীতিমতো ঋষি আলিয়া দু'জনেই। এইরকম সাইটের কথা আগে শুনলেও এই প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আলিয়ার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল, ওহ! শিট!

দেখা যাচ্ছে নিজার বিভিন্ন ভঙ্গিমার বেশ কিছু ছবি। সঙ্গে চার-পাঁচটা ছবি বেশ অশালীন ভঙ্গিতে—! দুটো ছবিতে একটি পুরুষের সঙ্গে যৌনক্রীড়ারত নিজা!

থমথমে হয়ে গেছে নিমেষে আলিয়া আর ঋষির মুখ। আলিয়া বলল, আই কান্ট বিলিভ। সিম্পলি

কান্ট বিলিভ। ভালো নর্মাল পিকচারগুলো নিজা ম্যাম-এর ফেসবুক থেকে নেওয়া হয়েছে। আর এগুলো তুমি কি লক্ষ করেছিস গলা থেকে জোড়া লাগানো হয়েছে অন্য বডি!

—দেখেছি। ফার্স্ট লুক-এই নোটিশ করেছি। কিন্তু একটা পিক অরিজিনাল। জাস্ট সি—।

লিজাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে গালে গাল ঘষে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষ। এই ছবিটাকেই নির্দেশ করল ঋষি। বলল, সি, দিস ইজ অরিজিনাল।

—আই থিন্ক হি ইজ দ্যাট দীপক। কোনও এক ক্লোজ মোমেন্টে ছবিটা ক্যাপচার করা হয়েছে অ্যান্ড ম্যাম জানত ছবিটা তোলা হচ্ছে।

—হুম। সেই পিরিয়ডটা দোজ হ্যাপি ডেজ-এর।... লোকটা খুব কানিংগলি কাজটা করেছে।

—হ্যাঁ কিছু অরিজিনাল আর কিছু ফেক দিয়ে... উফ্! মানুষ এত নিচে নামতে পারে?

—মানুষই পারে!

—ঋষি তুমি একটা কাজ করো। জাস্ট মেক আ কল টু দিজ নাম্বার। তুই জানতে চা সে কে। বাদবাকি তোর বুদ্ধি—।

—ওঃ কে। ডান।

দু'বার রিং হতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল
পুরুষের কণ্ঠস্বর—হ্যালো! কৌন হ্যায়?

—আপকা নাম স্যার?

—আপনে হি তো ফোন কিয়া। ঔর আপ খুদ পুছ
রহা হ্যায়...?

—স্যর, আজকাল অনেক চোর বদমাশ অনেক
রকম খারাপ কাজ করছে। যার তার নম্বর দিয়ে
ভুলভালো কাজ করছে। আসলে দীপক আমাকে
আপনার...

—ও হাঁ হাঁ, দীপক! দীপক মাই ফ্রেন্ড... বলিয়ে...
হাঁ ম্যায় অশোক গায়কোয়াড় হুঁ বলিয়ে বলিয়ে...।

—হাঁ, অশোক... অশোক ইয়াদ আগয়া... একটা
মেয়ের ফোন নম্বর দিয়ে আমায় বলল, মেয়েটাকে
শায়েস্তা করতে হবে।

—হ্যাঁ তো মুঝে ক্যা করনা হোগা? ম্যায় তো
উস্কো রাতভর ফোন করকে করকে... হা হা হা...।
দীপককে বিয়ে করবে বলে বিট্টে করল ওই লড়কি।

—কী হয়েছিল ঠিক বলবেন? আসলে দীপক সব
বলতে চায় না! বেচারা আপসেট!

‘হাঁ হাঁ জুরুর। দীপকের সঙ্গে রিলেশন করে এখন
বলে তু লম্পট লাফাঙ্গা। আরে বাবা, আদমি

লোকের আবার ক্যারেक्टर... হাঃ হাঃ। দীপক ভালো ছেলে। আমার বন্ধুর কম্পানিতে কাজ করেছিল কিছুদিন মুম্বইতে। আমার সঙ্গে আলাপ ওখানে...মন খুব ভালো। ইতনা বড়া দিল হ্যায় উস্কা।

—জানি। জানি।

—কিন্তু আপনি আমায় কেন? দীপক আমাকে ফোন করতে বলল কেন? আপ কৌন হ্যায়? রীতিমতো শঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে এখন অশোক গায়কোয়াড়ের গলায়।

ফোনের সংযোগ ছিন্ন করল ঋষি। লোকটা প্রাথমিক উত্তেজনায় কথাগুলো বলে ফেললেও হঠাৎই তার সে উপস্থিত বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে তা বুঝতে সময় লাগল না ঋষির।

আলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল ঋষি।

—একটা ব্রেক থু হল। দীপক যে পোস্টগুলো করেছে তা প্রভড্। এখন বড় প্রশ্ন, হু ইজ দেবাশিস?

—অনেক কিছু প্রভ করতে হবে আমাদের। কটা বাজে জানিস? সাড়ে আট। তুই আমায় কপি করে দে ভয়েসটা। আমি বাড়ি গিয়ে শুনব।

—ওঃকে।

ঘরবার করল লিজা। কলেজের ক্লাসে মন নেই। ফেসবুকে সবুজ আলো জ্বলেনি প্রায় বত্রিশ ঘণ্টা। মনে মনে হিসাব করল কলকাতায় আসার সময় হয়ে গেছে দেবাশিসের। ‘একটা ফোন তো করতে পারত! একটা মেসেজ অন্তত।’ অভিমান দুরন্ত হয়ে উঠেছে। সে নিজেই ফেসবুকে লিখে রাখল, খুবই অভিমান হচ্ছে আমার। তুমি বুঝবে না। কলকাতায় কি আসোনি এখনও?

আরও চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে।

‘আমি কলকাতার কাজ শেষ করে পৌঁছলাম ত্রিপুরায়। মিস যু বেবি। হাউ আর যু? লভ যু।’

প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল বুকে। অভিমান প্রেমে পরিণত। সে লিখল, ‘মিস যু টু। কবে আসছ?’

‘আসব। আসব। কলকাতায় কেন গেছিলাম জিজ্ঞেস করলে না তো?’

‘হয়তো তোমার পার্সোনাল কাজ।’

‘আমার আর তোমার মধ্যে এখন আর কোনও পার্সোনাল নেই। তুমি আমি এক। শোনো, সাউথ সিটিতে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। কিনে রেখেছিলাম। আমাদের পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করে

কিনেছিলাম। ত্রিপুরা আর ভালো লাগে না, মা নেই। বাবা নেই। এক প্রেমিকা ছিল। সেও বিয়ে করে সুখে আছে। আর আমার হাতে এখন অনেক পয়সা হলেও সুখ ছিল না। ভালোবাসার কেউ ছিল না তাই—। কিন্তু এখন আমি দারুণ সুখী নিজা। তুমি আমায় সুখী করেছ। আমার আর অপূর্ণতা নেই। কলকাতার ফ্ল্যাটটা সাজানো হয়নি। এইবার আমার ইনটিরিয়ার ডেকরেটরকে মিট করে সাজিয়ে দেওয়ার কথা বললাম। তোমার গৃহপ্রবেশ হবে মা লক্ষ্মী আমার।’

এতটা সুখ! এতটা সুখ কি কখনো স্বপ্নেও দেখেছিল সে? চিন্তাভাবনা কেমন্ড শুরু হয়ে গেছে নিজার। স্বপ্নাহত সে।

‘কী সুইটহার্ট? কী হল? কিছু বলো।’

‘কী বলব? কে কাকে বেশি ভালোবাসি জানি না। বুঝতে পারছি না যে!’

‘তুমি আমায় কমপ্লিট ম্যান করেছ।’

‘তুমি আমায় দেখতে আসছ কবে দেব?’

‘আসব। আসব। বুড়ি পিসিটার সঙ্গে দেখা হয়নি পাঁচ বছর। আগে একবার দিল্লিতে এসেছিলাম কাজে। ত্রিপুরায় আসা হয়নি। বুড়ি খুব রেগে আছে আমার ওপর। একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি বুড়িকে ফোন করো।’

খুব গাল দেবে আমায়। কিন্তু বাড়ির বউ হিসাবে পিসির আশীর্বাদ তোমার চাই। আর আমি এখানকার সিম নিয়ে তোমায় ফোন করব। এখন যাই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেব। বাই সোনা।’

ফোন নম্বরটা মোবাইলে সেভ করে রাখল লিজা। তর সইছে না যেন আর। স্থির করল ফোনটা করেই ফেললে হয়। তবু যেন আঙুল সরে না। ফোনের নম্বরে আঙুল ছোঁয়ানোর আগে ভেবেই সারা। কী বলবে সে ফোন করে? নিজের পরিচয় কী দেবে? আমি আপনার ভাইপোর প্রেমিকা? আমরা বিয়ে করতে চাই? আপনার আশীর্বাদ চাই? ছি ছি ছি! একথা সে বলতেই পারবে না। মহিলা ভাববেন কী? ভাববেন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে একটা। তা সে হতে দিতে পারে না।...তাহলে? কিন্তু ফোন তো করতে হবে। ভেবেই সারা সে। কী যে করে? কী যে করে?

—হ্যাঁরে তোর সেই কে বন্ধু তার খবর পেলি? মুখ অমন করে বসে আছিস?

লীলা কখন যে ঘরে ঢুকেছেন খেয়ালই করতে পারেনি সে। বলল, হ্যাঁ মা।... মা তোমাকে একটা কথা শেয়ার করতে চাই। কয়েকদিন ধরে বলব ভাবছি।...।

একটু কি আশঙ্কিত লীলা? বললেন, কী? প্রেমট্রেম করেছিস? কেমন বিষণ্ণ শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

—মা! আমি প্রেম বা বিয়ে করলেও তোমায় ছেড়ে যাব না। লীলার মানসিক অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হয় না লিজার। সেই কোন কালে স্বামীকে হারিয়ে মেয়েকে এক পৃথিবী করেই জীবনটার সায়াহ্নে পৌঁছেছেন আজ লীলা। সন্তান বিচ্ছেদ সহিবে কেন?

—তার মানে আমি যা ভেবেছি, তাই—?

মাথা নিচু লিজার। বলল, হুম, তুমি বিয়ে করলে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তোমাকে ছেড়ে কি আমিই থাকতে পারব নাকি?

—কে? ছেলেটি কে?

—আমার ফেসবুকের সেই বন্ধু যার খবর পাচ্ছিলাম না। জার্মানি থাকে। কলকাতায় ফ্ল্যাট আছে। সাউথ সিটিতে। পাইলট। আমায় বিয়ে করতে চেয়েছে।

—তা সে এত মেয়ে থাকতে তোমায় কেন? সে যে খুব সুন্দরী নয় তা তো তার অজানা নয়! লীলার এভাবে বলাতে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে সে।

—তা তাকে তুমি দেখেছ?

—না দেখা হয়নি। ফেসবুকেই কথা।

—ওসব বিশ্বাস করো না। দিনকাল ভালো না। না হলে আমার আর কী? তুমি ভালো থাকলেই ভালো। আমার কথা ভেবো না।

লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই ফোন করল লিজা। মন শক্ত এখন অনেক।

অসুস্থ কণ্ঠস্বর যে মহিলার শুনলেই বোঝা যায়, বললেন, কে? হ্যালো! কে বলছেন?

—নমস্কার। আমার নাম লিজা চৌধুরী।

—কে? কে? কে আপনি?

—পিসিমা আমার নাম লিজা। আমি আপনার ভাইপো আন্দ্রেই দেবাশিসের বন্ধু।

ও প্রাপ্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—পিসিমা!

—হ্যাঁ, তা কী চাই? আর কী নাম বললে আন্দ্রেই...

—দেবাশিস! আন্দ্রেই! আপনার ভাইপো, পাইলট!

—কী? ওর নাম আবার আন্দ্রেই হল কীভাবে? আর পাইলট? মহিলা যে মহা বিরক্ত বোঝা যায়। 'তা তোমার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?'

—ফেসবুক। হতচকিত লিজা।

—কী-বুক?

—পিসিমা! আমরা বিয়ে করতে চাইছি। আপনি যদি অনুমতি...। লজ্জায় গলা কেঁপে গেল।

—বিয়ে! আর কী বললে সে হতচ্ছাড়া পাইলট? মানে প্লেন চালায়? হায় ঈশ্বর! তার রিকশা চালাবার মুরোদ নেই গো মা! পাইলট? তাকে চমকে দিয়ে হো হো করে হাসছেন মহিলা। হাসছে তো হাসছেই।

বিরত লিজা। মহিলার কথাবার্তা রীতিমতো বিভ্রান্তিকর।

—পিসিমা!

—শোনো মা, আমার ওই জাইপোর সঙ্গে আমাদের কারুর সম্পর্ক নেই। তার জন্য তার বাবা মরে গেছে। মা-ও। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আর নয়! সে যা কাণ্ড করেছে এই বয়স পর্যন্ত তা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তুমি ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না। আর রাখলেও আমায় যোগাযোগ করো না। রাখলাম।

শূন্য থেকে ফেলে দিল যেন কে তাকে মাটিতে, কী বলল যে মহিলা তা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারছে না লিজা। মহিলার বলাতে কোনওরকম অসঙ্গতি নেই। বরং সম্পূর্ণ সঙ্গোপনেই যেন তিনি বললেন।

দেবাশিস তাহলে তাকে পিসির ফোন নম্বর

দিতেই বা গেল কেন? নাহ! কোনও কেনরই উত্তর মিলছে না লিজার। সে ফেসবুকে লিখে রাখল, ‘ফোন করো। কথা আছে।’

সন্দেহ দানা বাঁধছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে!

—পিসিমা!

—হ্যাঁ? কে? সেই মেয়ে?

—হ্যাঁ? আপনি কি দেবুর ওপর রাগ করে আছেন?

—না। ওর জন্য আমার ভাই মরেছে। ওর জন্য ফ্যামিলি শেষ! ওর ওপর রাগ করব কী?

—তাহলে আমি কী করব? শুকে ক্ষমা করে দেওয়া যায় না?

—তুমি চাকরি করে ওর ভার নিতে চাও? সে তোমায় খাওয়াবে কি? দিনরাত মদ গিলে রাস্তায় পড়ে থাকে।

—পিসিমা!

মাথা ঝিম ঝিম করছে লিজার। হতে পারে ভাইপো সামান্য অবাধ্যতা করেছে তা বলে তার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য এতগুলো মিথ্যে বলার দরকার ছিল না ভদ্রমহিলার। ফেসবুকে এতগুলো সাক্ষী তো মিথ্যে হতে পারে না! দেবাশিসের পাইলট

এয়ারহোস্টেস বন্ধুরা পর্যন্ত রয়েছে। তাদের সঙ্গে দেবশিসের ইন্টেরাকশন প্রকাশ্য। তারপরে আর তাকে সন্দেহ করার কী থাকতে পারে?

একটার পর একটা ঘাস ছিঁড়ে মুখে চালান করছে ঋষি। অনেক গরমের পর মেঘলা একটা আকাশ আজ। ঘাসের ফুল তুলে তুলে কোলের ওপর জড়ো করেছে আলিয়া। সমস্যার জাল দু'জনের মস্তিষ্ক জুড়ে।

—লিজা ম্যাডামের প্রবলেম আপাতদৃষ্টিতে দু'টো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোথাও গিয়ে তা একটা বিন্দুতে মিলছে।

ঋষি ঘাসের রস খেতে খেতে তাকাল, বলল, তেতো!

—আমার মনে হচ্ছে যতটা কমপ্লিকেটেড কেস মনে হচ্ছে ঠিক ততটাই নয়। ক্রিমিনাল ক্রাইম করবে আর চালাক হবে না তাতো ভাবাই ভুল। তবে ততটাই চালাক নয় যাতে আমরা ব্রেক থু করতে পারব না।

—লেট্‌স মেক আ কল। ঘাসের বিছানায় আধশোয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে পড়ল ঋষি।

—কাকে?

—ম্যামকে। আজ একবার ওর বাড়ি যাব।
রেকর্ডেড মেসেজে অনেক কিছু নেই।... আচ্ছা
দেবাশিস কী বলছে এখন?

—ম্যামের বক্তব্য অনুযায়ী সে সমানে ঘোরাচ্ছে।

—আর টাকাটা?

—টাকা আর ফেরত দিয়েছে।

—হাই বেবি!

—দেবাশিস!

—হ্যাঁ। চমকে গেছ? ভাবছ এত রাতে কোথা
থেকে উদয় হল মালটা? আইলভ যু বেবি।

আধো ঘুমের মধ্যে বিছানায় উঠে বসেছে লিজা।
মাথা কাজ করছে না এখনও।

—বেবি!

—তুমি দু'দিন কোথায় ছিলে? না ফেসবুকে, না
ফোনে!

—ফোন করেছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। একজন ফোন ধরে বলল, রং নম্বর।

হাঃ হাঃ হাঃ! গলা ফাটিয়ে হাসছে দেবাশিস,
বলল, আমার বন্ধু। তোমায় রাগিয়েছে। আমায়

বলেছে। আসলে আমার ফোনটা ওর কাছে ছিল... শোনো বেবি, আমি এমন একটা রিমোট প্লেসে আছি যে এখান থেকে ফিরতে পারছি না। জার্মানির জবটা তো ছেড়ে দেব। কবে কখন এয়ারক্রাশে মারা যাই! আর আমার বউটা বিধবা হবে তা তো হতে দেওয়া যায় না। তাই এখানে একটা বিজনেস ধরেছি। পাহাড়ি অঞ্চলে মোবাইল টাওয়ার বসানোর কাজ। অনেক ইনভেস্টমেন্ট। বাট এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে আমার প্রবলেম হচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও ব্যাঙ্ক নেই। আই নিড মানি। থার্টি থাউজেন্ড। তোমাকে একটা নম্বর দিচ্ছি। এই নম্বরে টাকাটা ধু ব্যাঙ্ক পাঠিয়ে দাও।

—টাকা! বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠেছে লিজার। টাকা! এতগুলো!

—কী হল? ভয় পেলে? আরে বাবা, তোমার কাছ থেকে কি নিতাম? এই টাকা আমার হাতের ময়লা বুঝলে? এখানে বিপদে না পড়লে...! ওংকে, ঠিক আছে থাক। তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না তো? তাহলে থাক। বাই।

মোবাইল হাতের মুঠোর মধ্যেই পড়ে রইল লিজার। দ্বিধা বিভক্ত সে।

এতগুলো টাকা! মানুষটাকে এখনও দেখলই না!
জার্মানি থেকে ইন্ডিয়ায় আসার পর থেকে এখনও
পর্যন্ত দেখা করতে এল না সে!

—আপনি দিলেন টাকা? আলিয়ার মুখ রক্তবর্ণ।

—আসলে কী জানো আমি এইরকম পাজলড
জীবনে হইনি। কী করব তখন বুঝে উঠতে পারছি না।
একদিকে যথেষ্ট সন্দেহ অন্যদিকে আবার সফট কর্নার
থেকে মনে হচ্ছে হয়তো সত্যিই বিপদে পড়েছে
মানুষটা। আমাকে নিজের বলে ভেবেছে বলেই তো
আমার কাছে চেয়েছে। আসলে জানো তো...আসলে,
অস্থিরতায় উত্তেজিত নিজা বলল, হ্যাঁ দিলাম
টাকাটা। তারপরেও ফোন করেছিল সে। একটু পরেই
ফোন করে বলল, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না না?
তুমি আমার বউ হবে, বিপদের দিনে তোমার কাছে
হাত পেতেছি। না হলে আমার টাকা কে খায়? আমি
দু'দিনের মধ্যেই পাহাড় থেকে ল্যান্ডে নেমেই তোমার
টাকা সুদ ফেরত দেব। ডোন্ট ওরি। এখানে ইঞ্জিনিয়ার
বলতে আমি একা আর ছয় জন লেবার। সবাই না
খেতে পেয়ে মরে যাব।

—আপনার একবারও মনে হল না এই ধরনের

ডিজাস্টারের সময় তার তো ত্রিপুরায় আত্মীয়বন্ধু সব আছে—। তারাই তো হেল্প...।

—হয়েছিল। হয়েছিল। তারপরেও...।

কোলের ওপর থাকা মোবাইলটা ভয়ার্ত মুখে হাতে তুলে নিল এই সময় লিজা। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ফোন আবার?

আলিয়া প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছে ফোনটা। সালোয়ার কামিজ ওড়না ফোনের ওপর জড়িয়ে বলল, ইয়েস!

অনেকগুলো লোকের হাসি আছড়ে পড়ল এক সঙ্গে।

—হ্যালো! দাঁতে দাঁত চেপে আলিয়া।

—হাই বেবি।

—কে আপনি?

—যাদের তুমি ডেকেছ ফোন নম্বর দিয়ে। আসব? পাইলটকে টাকা পাঠাতে পারছ আর আমরা কী দোষ করলাম বেবি?

—শুনুন এখানে আর ফোন করবেন না।

—কেন সোনা? কেন বেবি?

ঋষি ফোনটা নিয়ে নিয়েছে আলিয়ার কাছ থেকে। বলল, স্কাউন্ডেল! আবার গালাগাল দেওয়া হচ্ছে! বুঝতেই পারবি কত ধানে কত চাল!

—এই যে আপনি আবার কোন্ নাগর? লিজা হল আমার বউ। তাকে ইচ্ছামতো ন্যাংটো করে নাচাব। হাঃ হাঃ হাঃ।

—ক'দিনের মধ্যেই চাক্কি পিষবি, বুঝলি? যু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড।

হো হো হাহা করে হাসছে লোকগুলো।

ফোনের লাইন কেটে দিয়েছে ঋষি। মুখ থম্‌থম্‌ করছে। লিজা বলল, দেখলে তো ভাই?

—চিন্তা করবেন না ম্যাম। আমরা যতক্ষণ আছি চিন্তা করবেন না।

—কাল রাতে একটা ছেলে ফোন করেছিল, বলল, সাবধান হয়ে যান। যে কোনও দিন কিডন্যাপড্‌ হয়ে যাবেন। অনেক প্ল্যান হচ্ছে।

—নম্বরটা আছে?

—হ্যাঁ।

দ্রুতই ডায়েরি থেকে নম্বরটা বের করে দিল লিজা। নম্বরটা নিয়েই ফোন করল ঋষি নিজের ফোন থেকে, খুনখুনে গলার এক বৃদ্ধ কণ্ঠস্বর বলল, হ্যালো!

আলিয়ার হাতে দিয়ে দিয়েছে ঋষি। ইশারায় বলল, কথা বল।

—হ্যালো!

—কে? কে বলছেন?

—লিজা চৌধুরি।

—হ্যাঁ, কী ব্যাপার?

—আপনি কাল আমায় ফোন করে সাবধান করেছিলেন।

—হ্যাঁ।

—শুনুন আপনি আমায় সাবধান করলেন কেন?

—দেবাশিস কুত্তার বাচ্চাটা যে আপনার সঙ্গে খেলতেছে তা জানেন?

—আপনি তার কথা জানলেন কী করে?

—সে আপনার থেকে টাকা নিয়েছে না? ত্রিশহাজার?

—হ্যাঁ।

—আমি জানি সব। আমি কে জানতে চাইবেন না। আমি আপনাকে হেল্প করতে চাই। আপনার ছবি দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল, তাই।

—তাই কি?

—আপনাকে বাঁচানো দরকার মনে হয়েছিল।

—দেবাশিসকে আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ।

—সে আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছে না।

কিন্তু তাকে আমার খারাপ বলে মনে হয় না।

—জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।
আপনি অন্ধ হয়ে গেছেন। কী আর বলব? দরকার
হলে ফোন করবেন।

লোকটা ফোনের সংযোগ ছিন্ন করল।

থম্‌থমে মুখ আলিয়ার। বলল, লোকটার ভয়েসটা
কেমন জানিস? বাংলায় কেমন টান আছে!

লিজা বলল, ত্রিপুরা আগরতলার লোকেদের
অ্যাকসেন্ট ওই রকমই।

—লোকটা এজেড।

ঋষি মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ।

লোকটা হেল্প করতে চাইছে কেন? এটা একটা বড়
প্রশ্ন। চিন্তিত মুখ আলিয়ার।

—মনে হয় লোকটার সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে।
লিজার কণ্ঠস্বরে দ্বিধা। বলল, আবার নাও হতে
পারে! কী জানি? বুঝতে পারছি না কিছুই। আমাকে
বাঁচাও প্লিজ। আই কান্ট টেক এনি মোর। মাথার মধ্যে
এত চাপ নিয়ে আর পারছি না!

ঋষি আর আলিয়া পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।
একটু ইতস্তত বোধ আলিয়ার। বেশ কিছু প্রশ্ন করতে
গিয়ে অস্বস্তি লাগছে তার। হাজার হোক তার চেয়ে

বয়সে অনেক বড় এবং অধ্যাপিকা লিজা! তবু দায়িত্ব যখন নিয়েছেনই তখন সংকোচকে দূরে রাখতে হবে। একটু প্রস্তুতি নিয়ে আলিয়া বলল, আপনি কি মনে করেন দেবাশিস অনেস্ট মানুষ? ডু যু লভ হিম ম্যাম?

মাথা নিচু করে ফেলেছে লিজা। এই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর কাছে তারও কিছু সংকোচ বোধ হয়। তবু পরিস্থিতি এমনই যে এই সময়ে এদের ওপরেই আস্তা রাখতে পারে সে। পুলিশের ওপর ভরসা করতে লজ্জা হত আরও বেশি। মুখ নিচু করেই তাই বলল, এখন পাজলড্। এত লজ্জা আর ভয় লাগছে কী বলব!

ঋষি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, লজ্জা বা ভয়ের কিছু নেই। এরকম অনেক হয়। তবে আমাদের এবার লালবাজার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হেল্প নিতে হবে। ডোন্ট ওরি। আপনার যাতে কোনওরকম সম্মান নষ্ট না হয় তা দেখার দায়িত্ব আমাদের।

সভয়ে তাকাল লিজা, বলল, কেন? না জানালে হয় না?

—না ম্যাম। আপনার মুখ কেটে কিছু খারাপ ছবির সঙ্গে পোস্ট করা আছে কয়েকটা অ্যাডাল্ট সাইটে! ওগুলো মেইনলি আমেরিকান সাইট। ওইগুলো রিমুভ

করতে পারে একমাত্র গুগল। আর পুলিশ রিকোয়েস্ট না করলে ওরা কোনও গুরুত্ব দেবে না। তাছাড়া অ্যারেস্ট করার কাজটাও পুলিশের। আমরা তো সেটা পারি না। বাট আপনার সম্মানের ব্যাপারটা দেখার দায়িত্ব আমাদের।

মাথা নাড়ল লিজা। যদিও অস্বস্তিতে ভরা, তার অভিব্যক্তি।

—আজ আমরা উঠছি। যে কোনও সময়ে ফোন করবেন দরকার হলেই। আর আমাদের না জানিয়ে অচেনা অজানা কারুর ডাকে বাইরে যাবেন না।

আলিয়া ঋষির কথার সঙ্গে সঙ্গে বলল, কমপ্লিকেটেড হয়ে আছে ম্যাটারটা। অনেক লোক জড়িয়ে আছে। সো বি কশাস।

—ওঃকে। কিন্তু এই ফোন কল আমি আর নিতে পারছি না। একটু দেখো প্লিজ।

লিজার হাতে আলতো চাপ দিল আলিয়া; ভরসার। বলল বাই।

—কাল লালবাজারে যাব একবার বুঝলি? লিজার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বলল ঋষি।

—আমিও এটাই ভাবছিলাম। কারণ ওইসব সাইট

থেকেই ফোন কল আসছে ও পিকচার দেখে। ওটা মেইনলি বন্ধ হওয়া দরকার। তাহলেই ক্রিমিনাল পারভার্টগুলো প্রাইমারি একটা ধাক্কা পাবে।

—ইয়েস। আর একটা ব্যাপার, তোর কি মনে হয় না ম্যাম ওই স্কাউন্ডেলটার ব্যাপারে স্টিল উইক? আর এখানেই বিপদ।

—আমারও তাই মনে হয়। ভেরি মাচ উইক। অ্যান্ড বিপদ সেখানেই। মানুষ দুর্বল মুহূর্তে কারুর কথাই শোনে না তো!

—তুই প্রতি মুহূর্তে ফোনে কনট্যাক্ট রাখবি।

—ইয়েস।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে বাসিস্ট্যান্ডে চলে এসেছে দু'জনে কেউই খেয়াল করেনি। এমনকী মাথার ওপরে মেঘের কালো চাঁদোয়াটিও খেয়াল করেনি।

বাসস্ট্যান্ড তুলনামূলক ফাঁকাই এখন। আলিয়ার নাকের ডগায় একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই চমকে উঠেছে সে। এতক্ষণ দু'জনেই চিন্তায় মগ্ন ছিল।

—বৃষ্টি!

—কোথায়?

—এই দেখ, আমার নাকের ডগায় পড়ল। আকাশ দেখ।

—হুম্, চিন্তার ভেতরেই উত্তর দিল ঋষি। আর আকাশের দিক থেকে মুখ ফেরাতেই দৃষ্টি আটকে গেল উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার ওপর। ছোটখাটো চেহারার অতি শীর্ণ শরীরের বেশকিছু স্থানে শ্বেতীর আক্রমণ, দাড়ি গোঁফহীন, সম্পূর্ণ টাকমাথার লোকটা একটা গাছের আড়াল হয়ে তাদের দিকেই চেয়ে আছে। সিগারেট টানছিল লোকটা। তার দিকে দৃষ্টি বিনিময় হতেই সিগারেটটা ফেলে দিল সে। আর গাছের পাশ থেকে সরে এসে ফুটপাথের মাড়োয়ারির দোকানে কিছু খাবার কিনতে ব্যস্ত হল। যদিও তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি বলে দেয় তার মাথার পেছনেও একজোড়া চোখ আছে এবং সে লক্ষ রাখছে।

আলিয়ার বাস তখনই এসে পড়েছে। ঋষি লোকটার ব্যাপারে এখনই আলিয়াকে কিছু বলবে না স্থির করে নিয়ে বলল, তোর বাস! তুই বেরিয়ে যা। আমি একটু কাজ সেরে আসছি।

মাথা নাড়ল আলিয়া, না। অপজিট ফুটের লোকটাকে দেখ্। আমাদের ওয়াচ্ করছে অনেকক্ষণ।

মনে মনে খুশি ঋষি। তারিফ না করে পারল না

আলিয়ার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে। বলল, দেখেছি। তুই কখন দেখলি?

—আমরা লিজা ম্যামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন লেফট সাইড দিয়ে হাঁটছি তখন লোকটা আমাদের ক্রস করে বেরিয়ে গেল। ওর শরীর থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিলাম। পচা গন্ধ! তারপর মেইন রোডে এসেই রাস্তা ক্রস করল।

—আমি জাস্ট নোটিশ করলাম।

—কী করা উচিত?

—আমরা হেঁটে সামনের বাসস্টপের দিকে এগিয়ে যাই একটু। দেখি লোকটার মুভমেন্ট।

—ডান। চল। আলিয়ার হাত ধরে নিয়েছে ঋষি। মেঘ আরও থমথমে হয়েছে। বৃষ্টি যদিও আর নামলই না। সামনের দিকে খানিকটা এগোতেই আড়চোখে দেখে নিয়েছে দু'জনেই। লোকটাও উল্টো ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে।

আলিয়া ঋষিকে বলল, আমরা এখানেই হাঁটা থামাই। দেখি কী করে লোকটা!

—ওঃকে।

চলতে চলতেই থেমে গেল দু'জনে আচমকাই। ওপারের লোকটা বুঝতে না পেরে খানিকটা এগিয়ে

গেছে। আর তারপরেই ফিরে তাকিয়েছে পেছনের দিকে। ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সে খেয়াল করল সেখানেই থেমে গেল সে।

—লোকটা দাঁড়িয়ে গেল।

—শশশ, চুপ। ওর দিকে তাকাস্ না, বুঝতে দিস্ না বলে ঋষি আলিয়ার হাত ধরে টেনে কয়েক পা পেছনের দিকে হাঁটা দিল। কয়েক পা হেঁটেই দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটি যেন হতচকিত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে না পেরে পাশেই একটা দোকান থেকে কিছু কিনল বুঝি। ছোট পানবিড়ির দোকান।

—একটা কথা বল্ তো? লোকটা কে? আর আমাদের শ্যাডো করছেই বা কেন? তাহলে কি এই ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত? আলিয়ার প্রশ্নে ঘাড় নাড়ল শুধু ঋষি।

—আমার মনে হচ্ছে বড় একটা র‍্যাকেট, কী মনে হয়? ঘাড় নাড়ল ঋষি, হুঁ। লোকটার সঙ্গে কথা বললে হত।

—কেন?

—কথার টোন শুনলে বুঝতে পারতাম কোথাকার লোক। যদি ত্রিপুরার হয় তবে পূর্ববাংলার টান

থাকবে। আচ্ছা এই লোকটাই ম্যামের সেই বয়ফ্রেন্ড না তো?

—না। তার ছবি তো ফেসবুকে দেখলাম। হি ওয়াজ হ্যান্ডসাম।... আই ডাউট এই লোকটার সঙ্গে দেবাশিসের কানেকশন আছে। একটা বড় র‍্যাকেট ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যামকে একটা ফোন করে সতর্ক করে দিই, কী বল?

আলিয়ার কথায় সহমতো নয় ঋষি, বলল দরকার নেই। উনি ভয় পেয়ে যাবেন আননেসেসারিলি। চল, বাস আসছে। বাড়ি ফিরি। তোকে নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরব।

—বললি যে লোকটার সঙ্গে কথা বলবি?

—না।... বাস আসবে, চল।

কথার মাঝখানেই ওদের চমকে দিয়ে লোকটা এ পাড়ে চলে এল আর ওদের থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কাকে ফোন করার চেষ্টা করছে দেখতে পেয়েছে ঋষি আলিয়া।

আলিয়ার বাস এসে থামতেই দু'জনে দ্রুত উঠে পড়ল। বাসে ভিড় নেই বললেই চলে আজ। আলিয়া সিটে বসতেই দেখতে পেল লোকটাও বাসে উঠেছে আর উঠেই ড্রাইভারের পাশের দিকে খালি সিটে বসে

পড়ল। বুকের মধ্যে অজানা একটা শিরশিরে অনুভূতি খেলা করে গেল আলিয়ার। ঋষি পাশেই দাঁড়িয়ে। আলিয়ার কাঁধে হাত রাখল। চোখের ইশারায় বলল, ডোন্ট ওরি।

ভয় পাস না। আই থিঙ্ক লোকটা শুধু আজকেই নয়, আমাদের আগেও ফলো করেছে। কিন্তু আমাদের বাড়ির হদিশ পায়নি।

—কিন্তু আজ?

—পাবে না। তোর বাড়িতে না। ঢুকে তোর পরিচিত কারুর বাড়িতে ঢুকব আমরা। ওংকে?

রাস্তাও আজ ফাঁকা। কোনওরকম জ্যামজট ছাড়াই আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল দু'জনে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। অনুমানমতো লোকটিও নামল বাস থেকে। ঋষি আর আলিয়া আলিয়াদের বাড়ির গলির মধ্যে ঢুকতেই লোকটাও সামান্য তফাতে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঋষি আর আলিয়া হাঁটছে। আলিয়াদের বাড়ি ছেড়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ঋষি আচমকাই ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল। আলিয়া নিজেও হতবাক। লোকটা ততোধিক হতচকিত। ঋষি সরাসরি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

বলল, আপনি কে বলুন তো? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আমাদের ফলো করছেন? ব্যাপারটা কী?

এক মুহূর্ত সময় নিল না লোকটা, বলল, আমি আপনাদের ফলো করব কেন? আপনারাই তো ফলো করতেছেন।

—তাই? আচ্ছা! মাথায় রক্ত চড়ে গেছে যেন ঋষির, বলল, আর একবার যদি আমাদের পেছনে আপনাকে দেখি...

আলিয়ার হাত ধরে হন্থন্থ করে হেঁটে গলি ছেড়ে বেরিয়ে এল ঋষি। বলল, এখন না। পরে বাড়িতে ঢুকবি, মাকে একটা ফোন করে দে।

গলি থেকে বেরিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে বসল দুজনে।

—লোকটার ভাষা শোনার জন্যই কথা বললাম আর অ্যাটাকটা করলাম। যা ভেবেছি তাই। মালটা কলকাতার নয়। ফেসবুক অন কর তো?

আলিয়া ফেসবুক অন করতেই দেবাশিসের প্রোফাইল চেক করল ঋষি। মোবাইল অনলাইন দেখা যাচ্ছে শুধু। নতুন কোনও স্ট্যাটাস পোস্ট করেনি। শেষ স্ট্যাটাস ছিল, নিউ অ্যাডভেঞ্চার।

দেবাশিসের ফোটোতে ক্লিক করতেই বেরিয়ে এল

ছবির পর ছবি। এক মহিলার সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ দুটো ছবিও চোখে পড়ল। কিন্তু মহিলাটি কে তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা নেই।

দেবাশিসকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রাখল ঋষি আলিয়ার নামে। সঙ্গে ছোট্ট একটা মেসেজ, হাই! য়োর প্রোফাইল ইজ সাচ অ্যান ইন্টারেস্টিং... দ্যাটস্ হোয়াই উড লাইক টু মেক ফ্রেন্ডশিপ উইথ য়ু।

আরও খানিকক্ষণ পরে ওরা দু'জন যখন বেরিয়ে এল তখন বৃষ্টি নামবে নামবে করছে।

লোকটাকে আর কোথাও দেখা গেল না। আলিয়াকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাস ধরে বাড়ির পথে এগোল ঋষি। মাথার মধ্যে প্ল্যানগুলো সাজানো চলছে তখনও।

ফোন! ফোনে অজানা নম্বর দেখেই বুক কঁপে উঠেছে আবার লিজার। কাঁপা হাতে ফোন ধরল সে, হ্যালো!

—দেবাশিস! দেবাশিস!

—তুমি! তুমি কোথায়? ফোন করলে সুইচড্ অফ! আর এদিকে কেউ কেউ তোমার নামে আজেবাজে

কথা বলছে আমায় ফোন করে! তারা আমার নম্বরই বা পায় কোথা থেকে? তুমি যদি না দাও।

—কে? কে ফোন করেছে তোমায়? আমার বউকে কে খারাপ কথা বলে শুনি?

অভিমাণে ঠোট ফুলছে নিজার। কোনওদিনও তো কাউকে এইভাবে ভালোবাসেনি সে! চোখ উপচে জল নামছে। কথা বলতে গিয়ে অভিমাণে হারিয়ে যাচ্ছে কথা চোখের জলের সঙ্গে।

—কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন? নিজা?

—তুমি কবে আসবে? কবে? তোমার নামে পিসিমা বলছে। তোমার নামে আশীনা লোক বলছে। আয়্যাম কনফিউজড্ দেব। আয়্যাম কনফিউজড্।

—আমি যদি বলি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম? বিশ্বাস করবে? করবে? আমাক এক ফ্রেন্ডকে দিয়ে আমিই ফোনটা করিয়েছিলাম। দেখছিলাম তোমার মতো সুন্দরী এইসব শোনার পরেও আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে কি না!

—রাখি বাট আয়্যাম কনফিউজড্! প্রায় কুড়ি দিন হল তুমি ইন্ডিয়ায় এসেও আমার সঙ্গে দেখা করার সময় পেলে না! এর মানে কী?

—এর মানে আর কিছু নয় বেবি। আমি একটু

গুছিয়ে নিচ্ছি। চাকরিটা ছেড়ে দিলে খাব কী, তোমায় তো আর যেমন তেমন রাখতে পারি না?

—পিসিমা ওসব বলল কেন?

—আমার ওপর রাগ। অনেক মেয়ে দেখেছে আমার জন্য, আমি রিফিউজ করেছি তাই। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে পিসিমণির। মেনে নিয়েছে। তোমার জন্য প্লেনের টিকিট করেছি। আমার লোক অলরেডি কলকাতায় চলে গেছে তোমাকে আনতে। আমার বউকে তো আর আমি একা আসতে দিতে পারি না? তুমি একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ হতে চলেছ। পিসি তোমায় দেখতে চেয়েছে আশীর্বাদ করবে বলে।

হতবাক হয়ে গেছে বিস্ময়ে নিজা। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

—কী, খুব চমকে দিলাম তো?

—আমি! আমি যাব তোমাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ। আজ রাত আটটা নাগাদ লোক আসবে। আমার এক ফোর্থক্লাস স্টাফ। আর ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার যেটা সেটা হল কাউকে ঘটা করে কিছু বলার নেই। আমি এখানে বিজনেস স্টার্ট করেছি সেটা এখানকার কিছু মাফিয়া ভালো চোখে দেখছে না। আমার পেছনে লেগেছে। আর এত বছর আমি বিদেশে

থাকি... তাই বন্ধুবান্ধবদের থেকেও একটা ডিসট্যান্স বেড়েছে...। বাদল আসবে একটু পর। তোমার রিটার্ন টিকিটও কাটা আছে।

—এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? আমি প্রিপেয়ার্ড নই।

—তাহলে আসবে না! তুমি আসবে না? পিসি রাজি হল বলে আমি আর শুভসময় নষ্ট করতে চাইলাম না। পিসি তোমার জন্য জড়োয়ার সেট রেখে দিয়েছে। প্লিজ—। কালই আবার ফিরে যেও। তাই রিটার্নও কেটেছি। দু'জনে একসঙ্গে ফিরব।

—মাকে কী বলব?

—বলো কেউ একটা অসুস্থ তাকে দেখতে যাচ্ছে। ভালো কাজের জন্য একটু মিথ্যে বললে প্রবলেম নেই। এখনই বাদল আসবে। জামাকাপড় কিছু আনার দরকার নেই।

—আচ্ছা।

ফোন হাতের মুঠোয় ধরে বসে রইল লিজা। চিন্তাভাবনা আর সোজা খাতে বইছে না যেন! সন্দেহ দ্বিধা বিশ্বাস অবিশ্বাস সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দেবশিসের কথার গভীরতায় ডুবে আছে সে। আবার সন্দেহ আক্রমণ করছে। মনে মনে ঠিক করল,

অবশ্যই ঋষি আলিয়াকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।

ফোন বাজছে।

—হ্যালো!

—জান আসছ তো? আজ পূর্ণিমা! আমি তোমার জন্য ওয়েট করছি এমন একটা রাজপ্রাসাদে ভাবতেও পারবে না! সারপ্রাইজ!

—পিসি কোথায়?

—আমার কাছে। কথা বলবে?

—না থাক। আসব। কিন্তু খালি হাতে আসব কী করে।

—খালি হাতে আসবে কেন? তোমার ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আসবে। কাল পিসির জন্য কিছু কিনে দেবে। ব্যস্। এসো। ওয়েটিং। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে লিজা এই প্রথম তোমাকে দেখতে পাব! বাই। সি য়ু।

কলিংবেল বাজার শব্দ হল তখনই। বুকের ভেতর একরাশ উত্তেজনা! মনে হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা এখনি খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

দরজা খোলার আগেই আইহোল দিয়ে দেখে নিয়েছে লিজা। কালো রোগামতো খেঁচুড়ে চেহারার একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাহলে এই-ই বাদল? দরজা খুলে বসতে বলব?
তারপর মাকে বলে... ঋষি আলিয়াকে একটা ফোন...
খুব দ্রুত চিন্তাগুলো বয়ে গেল মাথার মধ্যে। ভাবতে
ভাবতেই দরজা খুলে দিয়েছে নিজা।

নিমেষেরও কম সময়ের মধ্যে এক কক্ষ গহ্বরে
প্রবেশ করল সে।

বাড়ি ফেরার পরেও লোকটার ব্যাপারটা মাথা
থেকে সরল না ঋষির। ছেলেকে অহেতুক চিন্তিত
দেখে সুপ্রিয়া বললেন, কী হয়েছে রে? প্রবলেম?

—না, মা। নাথিং।' বলে পাশ কাটিয়ে নিজের
বেডরুমে চলে এল ঋষি।

আলিয়ার ফোন এল তখনই, ঋষি। ম্যামের ফোন
সুইচড্ অফ! একবার বলল, নট রিচেবল্। তারপর
থেকে সুইচড্ অফ্। কী ব্যাপার?

ধক্ করে উঠেছে ঋষির বুক। যা আশঙ্কা করছিল
তাই হল না তো? বলল, কখন করলি?

—জাস্ট। ভাবলাম অ্যালার্ট করে দিই লোকটার
ব্যাপারে, তাই করলাম...। ভয় লাগছে।

—আমি জাস্ট ভাবছিলাম ফোন করব। আমি
দেখছি।

‘সুইচড্ অফ! সুইচড্ অফ!’ এমন হওয়ার কথা নয়। আজ পর্যন্ত ম্যামের ফোন অফ্ থাকেনি! তাহলে? বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ঋষি। স্থির করল একাই এখনি লিজার বাড়ি যাবে।

—পেলি? ফোন পেলি?

—না। আমি যাচ্ছি ম্যামের বাড়ি। তোকে ফোন করব।

ট্যাক্সি নিয়ে লিজার বাড়িতে পৌঁছাতে আজ বেশ কিছুটা দেরি হল। বৃষ্টি নেমেছে শহরে প্রবল ধারায়। লিজার বাড়ি যখন পৌঁছাল তখন রাত সাড়ে নটা। দরজা খোলা দেখে চমকে গেছে ঋষি প্রথমেই। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই ভেতরে অনেক মানুষের উত্তেজিত কথাবার্তা কানে এল।

ড্রয়িংরুমে অনেক মানুষ। তাকে দেখেই লীলাদেবী প্রায় আর্তনাদ করে চেয়ার ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, ঋষি! বাবা, তোমরা আজ-ই না এসেছিলে?

তোমরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মেয়েকে ডাকতে এসে দেখি মেয়ে আসার নেই...! বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন লীলা চৌধুরি। সমবেত উপস্থিত লোকজন কৌতূহলী হয়ে প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে ভাই?

‘ঋষি দ্রুত নিজের পরিচয় দিয়ে আলিয়াকে ফোন করল, শোন যা আশঙ্কা করেছিলাম... ম্যাম হ্যাজ বিন কিডন্যাপড্। সো ফার আই থিন্ক। আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি। তারপর জানাচ্ছি। তুই সাবধানে থাকবি। বাড়ি থেকে বেরোবি না।’

—আমাকে বলুন আপনি ঠিক কখন কী দেখলেন? অসম্ভব ভয়ে থরথর কাঁপছেন লীলাদেবী আর কেঁদে চলেছেন নাগারে, বললেন, আমি তো রাতের খাবার খাই সাড়ে আটটাতে... মেয়েই দেয়। আজ আমায় ডাকল না দেখে... আমি উঠে এসে দেখি ও ঘরে নেই। আর ফ্ল্যাটের দরজা হাঁ করে খোলা। আমায় না বলে তো এভাবে কোথাও যায় না... ঋষি ও নিশ্চয়ই বাজে কোনও পাল্লায় পড়েছে... তোমরা দেখো... আমার তো আর কেউ নেই... আত্মীয়স্বজন বলতে এই পাড়া প্রতিবেশী...।’

লীলাদেবীকে ‘সান্ত্বনা দিতে দিতেই কসবা থানার পরিচিত অফিসার অনির্বাণ রায়কে ফোন করল ঋষি।

—আরে ঋষি! অনেকদিন পর! কী ব্যাপার গো?

অনির্বাণ রায় সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটা শোনার পর বললেন এটা তো আমাদের আন্ডারে নয়। তুমি বাঁশদ্রোণী থানায় জানাও। আমি লালবাজারে জানিয়ে

দিচ্ছি। লালবাজারে না জানালে হবে না। এটা আন্তঃচক্র পাচারকারী ক্রিমিনালের কাজ।

হাত-পা অবশ ঠান্ডা হয়ে আসছে ঋষির। আক্ষেপ হচ্ছে লোকটার কথা লিজাকে না জানানোর জন্য। একটু বকাবকিও করলেন। তোমরা দায়িত্ব নিয়েছ ভালো কথা। কিন্তু ব্যাপারটা তো সাইবার ক্রাইমের আন্ডারে পড়ে। কাজটা ঠিক করেনি ঋষি। আমার বন্ধু আছে সাইবারে আমি কথা বলছি। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। এখনই সব কটা স্টেশনে অ্যালার্ট করে দিতে হবে।’

আকাশ জুড়ে জ্যোৎস্না! সুদী আলোর চাদর নেমে এসেছে আকাশ থেকে।

জ্ঞান ফিরছে একটু একটু করে লিজার। অল্প তাকায় আবার ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। যখন পূর্ণ চোখ মেলে তাকাল সে তখন চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্যোৎস্না।

মস্তিষ্ক জুড়ে নিদ্রাঘোর তখনও। কোনও কিছু চিন্তা করার শক্তি পেল না। চোখ বন্ধ হয়ে এল আবার। আরও ঘণ্টাখানেক পর সম্পূর্ণ চেতনায় ফিরল সে। প্রথমেই তার মনে হল তার পিঠের তলায় মাথার

তলায় উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো ভূমি! ভগ্নাংশেরও কম সময়ে সে বুঝতে পারল সে তার বাড়িতে নেই! এক ঝটকায় উঠে বসেছে সে। আর তখনই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সে।

প্রায় অন্ধকার ঘর। কোনও একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ভেতরে সে আছে। জানালা দরজা বিহীন ঘরে চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে এই ফাঁকফোকর দিয়ে! কিছু বোঝার আগেই যে মূর্তিটি তার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে ভয়ে আতঙ্কে জবুজবু হয়ে গেল লিজা।

তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লোকটা। হাসছে। ওপরের পার্টির মাড়িতে পরপর দুটো দাঁত নেই তার। গা থেকে পচা গন্ধ! লোকটার ডানপায়ের পাতা ব্যান্ডেজ করা। এই লোকটা! এই লোকটাই তো...! কুঁকড়ে দু'পা পিছিয়ে গেল লিজা। বলল, আমাকে এখানে এনেছেন কেন? কে আপনি?

—সে কী বেবি! আমার গলা শুনেও বুঝতে পারছ না? হা হা হাঃ তোমার স্বামী দেবশিস! পাইলট!

লিজার ভয়ানক কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এল, যু স্কাউন্ডেল!

খ্যাক্ খ্যাক্ করে বিস্তীর্ণ হাসছে দেবশিস, বলল,

একটা চুমু খাই? তোমার ফুলো ফুলো লিপ্সে একটা চুমু খাই বলে এগিয়ে আসতেই এক ধাক্কা সরিয়ে দিয়েছে তাকে লিজা।

—আমার পায়ে কুষ্ঠ! বুঝলে? পাপ তো জীবনে অনেক করেছি... হে হে... তুমিই বোধহয় শেষ কাজ...! হে হে তবে তোমার মতো বড় মাল এই প্রথম। মালকড়ি ভালোই পাব।

ভয়ে ঘৃণায় রাগে থরথর করে কাঁপছে লিজা। উঠে জানালা বিহীন উন্মুক্ত খোপের সামনে চলে গেছে সে। এক ঝলক দেখে নিল সে রাস্তা। টিমটিমে কয়েকটা ল্যাম্প পোস্টে আলো জ্বলছে। শুনশান রাস্তা। লোকজন চোখেই পড়ল না।

—এই মাগি। বলে এক হ্যাঁচকায় লিজাকে জানালার পাশ থেকে সরিয়ে আনল দেবশিস। তারপর সপাটে এক থাঙ্গড় মারল গালে। বলল, ভোরের আগেই এখান থেকে পাচার হয়ে যাবি তুই। আর টাকা নিয়ে আমি সোজা আসাম। হে হে হে...। মাইরি বলছি আমার লাইফে তুই হলি একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। টুসটুসে চেহারার অধ্যাপিকা! হা হা হা হা...।

—কী চাস তুই?

—বিক্রি করে দেব তোকে। আমার অনেক টাকার দরকার। মানি মানি, মানি বেবি। ওনলি মানি!

—আমায় ছেড়ে দিলে আমার ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে সব দিয়ে দেব।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দেবাশিস। হাসছে তো হাসছেই। হাসতে হাসতে বলল, তার চেয়ে বেশি টাকা যে আমি তোকে বেচে পাব। তার আগে তোকে একটু চেখে দেখি। কদিনের সাধ!

হাতপায়ে স্নায়ুদৌর্বল্য বোধ করছে লিজা। মাথা কাজ করছে না। মোবাইলটা হাতে নিয়ে সে দরজা খুলেছিল মনে পড়ছে। তার মানে তার মোবাইল আর তার কাছে নেই। রাত যে অনেক হয়েছে এইটুকু বুঝতে পারছে সে। ফ্ল্যাটের নির্মীয়মাণ উন্মুক্ত স্থানগুলো দিয়ে শুধু গভীর নিশুতি রাত বোঝা যায়। মেঝেতে বসে পড়ল লিজা। দেখছে দেবাশিসকে। শুধু ভয় নয় ঘৃণার অনুভূতি সমস্ত চেতনা জুড়ে।

দুটি লোক ঘরে ঢুকল এই সময়ে। হাতে মদের বোতল।

চুপচাপ দেখছে লিজা। এখান থেকে বাঁচার একটাই উপায় রাস্তায় কাউকে দেখলে চিৎকার করা। কিন্তু সে উপায় নেই। জানালার জন্য বরাদ্দ ফাঁকা

জায়গা থেকে অনেক দূরে মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

মদ গেলাসে গেলাসে ঢালল তিনজন। পান করতে করতে চাপা স্বরে কিছু আলোচনা করছে তিনজনে যা শুনতে পেল না সে।

রুবায়েৎকে জানিয়েই ঋষিকে ফোন করল আলিয়া, শোন, আমি আসছি। তুই কি লালবাজারে?

—না। লিজা ম্যামের বাড়িতে। তবে এখনই যাব। বাট তুই...?

—মম্কে বলেছি। অ্যান্ড গট পারমিশান। সি ইজ আ নাইস লেডি।

—ওঃকে, আমি তোকে পিক আপ করছি।

আলিয়ার সঙ্গে কথার মধ্যেই অনির্বাক্ত রায়ের ফোন, ঋষি ভদ্রমহিলার পিকচার আছে তোমার কাছে?

—আছে।

—তাহলে এখনই সাইবার ব্রাঞ্চে ও সি তারাপদ আচার্যকে মেল করে দাও। দেন আমি তোমায় নিয়ে লালবাজারে যাচ্ছি। ছবিটা ইমিডিয়েট মেল করো। এখনই এয়ারপোর্ট, স্টেশনে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আধুনিক প্রযুক্তিকে ধন্যবাদ জানাল ঋষি আবার।
মোবাইল থেকেই মেল করে দিল সে লিজার কয়েকটি
ছবি সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে।

লীলাদেবীকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে পড়ল যখন
তখন রাত দশটা সতর্ক দৃষ্টি রেখেই ট্যাক্সি নিয়ে
আলিয়ার বাড়ি থেকে আলিয়াকে তুলে সোজা
অনির্বাণ রায়ের কাছে পৌঁছাল। দুজনেই মনে মনে
প্রস্তুত অফিসারদের কাছ থেকে তিরস্কৃত হওয়ার
জন্য।

একটার পর একটা ক্রিমিনালদের ছবি দেখালেন
তারাপদ আচার্য ঋষিদের।

নাহ! একটাও এর মধ্যে সেই লোকটা নয়!

তারাপদ ও তার দু'জন অফিসার এই মুহূর্তে
অফিসে উপস্থিত। তারাপদই বললেন, মে বি আগে
কোনও ক্রাইম করে ধরা পড়েনি। কিন্তু আপনারা
দু'জনে একটা মস্ত ভুল করেছেন আমাদের না
জানিয়ে।

আলিয়াই বলল, স্যার, আমরা ইমিডিয়েট
আপনাদের ইনফর্ম করতাম, বাট তার আগেই
মিসহ্যাপটা। আসলে ম্যাম কিছুতেই চাইছিলেন না যে

পুলিশ জানুক। ওঁর রেসপেক্ট নিয়ে খুব ক্রেজি ছিলেন তাই—।

জুনিয়র অফিসার প্রবাল রায় বললেন, আই থিঙ্ক এখান থেকে পাখি পালিয়েছে। আগরতলার ফ্লাইট বেরিয়ে গেছে আগে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ফোন এল তখনই। লিজা চৌধুরি ও আশিস দত্ত জাস্ট আগরতলার ফ্লাইটে বেরিয়ে গেছে। লিজা চৌধুরি অসুস্থ ছিল। ছইল চেয়ার দেওয়া হয়েছিল তাকে...।

লাফিয়ে উঠেছেন তারাপদ আচার্য, আর দেরি করা যাবে না। বলতে বলতেই আগরতলা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন। মেল করে দিলেন লিজার ফোটো।

ঋষি বলল, কিন্তু স্যার লিজা ম্যামের আইডেনটিটি প্রুফ কিছু না থাকলে এয়ারপোর্ট অথরিটি ছাড়ল কী করে? সি হ্যাজ বিন কিডন্যাপড্! তাহলে সে তো আর পাসপোর্ট, ভোটার আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল না?

—রাইট। কথায় যুক্তি আছে।

প্রবাল রায় বললেন, কিডন্যাপ করার পর চুরি

করেনি তো ঘর থেকে? ওঁর বৃদ্ধা মা তো অন্য ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন!

আপত্তি জানাল আলিয়া, বলল আই থিঙ্ক ম্যামকে ট্র্যাপে ফেলা হয়েছে। ম্যামের ব্যাগেই ছিল আর তা তাকে আনতে বলা হয়েছিল।

একের পর এক ফোন করে চলেছেন তারাপদ আচার্য। প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

আলিয়া চাপা স্বরে বলল, খুব ভয় লাগছে জানিস্!

—ভয়ের কিছু নেই।

—তুই বুঝবি না, আমি কেন বলছি।

—আই আভারস্যাভ।

জানালার দিকে একবার যাওয়ার চেষ্টা করতেই হাত ধরে টেনে আনল তাকে দেবাশিস।

জ্যোৎস্নার আলো তার মুখে পড়েছে। দৃশ্যত ভয়াবহ সেই মুখ। চুলহীন একটা চকচকে মাথা, সারা মুখে গলায় শ্বেতীর ছোপ তার কালো রঙকে আরও ভয়াবহ করেছে। হাসলে কথা বললে দাঁতহীন মুখটা আরও ঘিনঘিনে দেখায়। সেই মুখ এখন ক্রোধে ভয়ংকর। বলল, শালি—! তোর আর মুক্তি নেই।

আমার ফাঁদে যে কটা মেয়ে পড়েছে, শেষ বুঝলি? হা হা হা, তারপরেই সুর নরম করে লিজার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল সে। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, এই এত বড় আমার রাজপ্রাসাদে তোরা এখানে কী করছিস? যা ভাগ। হে হে। আমি এখন আমার রাজকুমারীকে নিয়ে ফুলশয্যা করব। হে হে হে...। ভাগ শালারা।

—ওস্তাদ আমাদের ভাগ? একটা লোক তার মধ্যেই বলে উঠল।

—পাবি। পাবে বাবা পাবে। ওস্তাদ খেয়ে প্রসাদ করে দেবে, তোমরা সেই এঁটোটা খাবে। হে হে হে...। এখন ভাগ। আর নজর রাখিস। ওই শালা রঞ্জন কিন্তু কিছু একটা করে দিতে পারে। ফেউয়ের মতো পড়ে আছে পেছন পেছন।

—হ্যাঁ ওস্তাদ। তোমার আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

—কী করব বল শালা? মোবাইলে পয়সা নেই। নেট প্যাক ভবে যা খরচ হত তার চেয়ে সাইবার কাফেতে খরচ কম পাঁচ মিনিট চ্যাট করতে। এই শালিকে তো পটাতে হবে। তাহলেই লক্ষ্মী আসবে ঘরে। হাঃ হাঃ, বলতে বলতে লিজাকে জড়িয়ে ধরে আলতো করে তার গালে চুমু খেতেই লিজা মুখ

সরিয়ে নিয়েছে এক ঝটকায়। দুর্গন্ধ মানুষটার সারা শরীরে। মুখে।

—কী হল বেবি? আজ আমাদের প্রথম দেখা! তুমি তো তোমার দেবশিসকে দেখবে বলে পাগল হয়ে গেছিলে সোনা! এখন প্রাণভরে দেখো।

—যু স্কাউন্ডেল! সেটা তুই না। জালিয়াত! বদমায়েশ। রাগে থরথর করে কাঁপছে লিজা। এখনও বুঝে উঠতে পারছে না ফেসবুকের দেবশিস তো এই লোকটা নয়, তাহলে...?

হাসছে আশিস, বিস্তীর্ণ ভঙ্গিতে, বলল, এখন আর ভয় নেই তাই তোমায় বলতে পারি সব কথা। আমার বউ বলে কথা! তোমায় শেখাবি করব না তো কাকে করব? হুঁঃ!

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লিজা। একটু সরে বসেছে। লোক দুটো চলে গেছে। যাওয়ার সময় বলে গেল, ওস্তাদ ছাদের সিঁড়িতে আছি। নজরও রাখতে পারব আর তুমি ডাকলেই চলে আসব ফুলশয্যা করতে। হে হে...।

দামি একটা বিদেশি সিগারেট ধরাল আশিস। লিজার মুখের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে, বলল, ফুলশয্যার রাত! ভেবেছিলাম তোমায় নিয়ে

ফাইভস্টার হোটেলে মধুচন্দ্রিমা পালন করব। তা আর হল না! ওংকে নেক্সট জন্মে। হে... হে...। আচ্ছা, তোমায় তো বললাম আমার নাম আশিস, তাই না? ভুলেও যাই। সোনামণি, তুমি যার ফোটো দেখে প্রেমে পড়েছিলে সে আমার পিসতুতো ভাই, দেবাশিস! দুজনে এক দিনে জন্মেছিলাম! ভাগ্য দেখো। একজন পাইলট আর একজন ভবঘুরে ক্রিমিনাল! ভাইয়ের কাছে বিজনেস করব বলে কিছু টাকার ধার চেয়েছিলাম। বলেছিলাম দাও। শোধ করে দেব ইন্টারেস্ট সহ। বললাম, তোমার সুস্থ ভাই। ভিক্ষা করে খায়, তাকে হেল্প করা কি তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না দাদা? তা সে বলল, গো টু হেল। হা হা হা...।

বিস্ময়ে হতবাক লিজা। লোকটা বলে কী এইসব!

—তোমার হাতটা দাও সোনামণি। বলে লিজার ডানহাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু খেল।

বমি আসছে লিজার। এত দুর্গন্ধ! এত দুর্গন্ধ!

গরাদহীন জানালার কোটর গলে চাঁদের আলো লিজার মুখের ওপর। লিজার মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছে আশিস। অনেকক্ষণ দেখার পর বলল,

চেয়ে থাকি প্রিয় ওগো...তুমি আমার মনের মাধুরী মতো!

...একটা কথা তোমায় না বলে পারছি না। তোমায় বিক্রি করে দেওয়ার পর আমার কিন্তু অনেক মন খারাপ হবে। তোমাকে বিক্রি করতে আমি চাই না জান। তোমাকে আমি ভালোবাসি। রিয়েলি আই লভ য়ু। যেদিন ফেসবুকে তোমার পিকচার দেখলাম প্রথম সেইদিন চমকে গেছিলাম। বারবার দেখেছিলাম। বারবার চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, এত সুন্দর। এ তো দেবী-প্রতিমা! বিয়ে করলে একেই করব।’

—চুপ! আর একটা কথা বলবি না। একটা কথা না...।

—হে হে... সত্যি বলছি। এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি দেখো। পয়সা থাকলে তোমায় বিয়ে করতাম। তারপর না হয় ভাড়া খাটাতাম! তাতে কী? বউ তো রইলে। কিন্তু এখন তো আর তা সম্ভব না। তুমি আমায় বিয়েই করবে না। করলে আমরা দু’জনে মিলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। করবে না জানি... হে হে...।

লোকটাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করছে লিজার

এই মুহূর্তে। কিন্তু নিরুপায়। চিন্তার স্রোত ভয়াবহরূপে বইছে। তার পরিণতি কী হতে চলেছে তা সম্পূর্ণ অজানা। মনে পড়ছে দরজা খোলামাত্র এই লোকটাই বলল, গুড ইভনিং ম্যাম! আমি বাদল। স্যার পাঠিয়েছেন। আপনি রেডি তো?...

লোকটাকে দেখেই কেমন খারাপ একটা অনুভূতি হয়েছিল তার। তাই বলেছিল, না। একটু দাঁড়ান। আমি আসছি। এইটুকু মনে পড়ছে তার। সে পেছন ফিরতেই লোকটা একটা কাপড় চাপা দিয়ে দিয়েছিল। আর মনে নেই। কিছু না।

সোনামণি এসো মধুযামিনী স্বপ্ন করতে করতে গল্প বলি তোমায়। হে হে... ঘেন্না করছ আমায়? ওরে আমার লালটুকটুকে বউ! ঈশ্বর কৃপাময়! না হলে তোমায় পাই? তবে আমায় এত খারাপ দেখতে ছিল না, জানো? বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে! বাবার কাঠের বিজনেস হেব্বি মালদার লোক ছিল, বুঝলে? বলেই হাসল, আহা! সে কী সোনার দিন! আমার দুহাতে কাঁচা টাকা। স্কুলের ফাইনাল পার হওয়ার আগেই সেক্স করি ওই পিসির মেয়ের সঙ্গে। হে হে... এত হ্যান্ডসাম ছিলাম যে কোনও মেয়ে আমায় রিফিউজ করত না। তার ওপর পয়সা...! মেয়েরা

আসলে খুব লোভী। পয়সা পেলে আর কিছু চায় না। পিসতুতো বোন প্রেগনেন্ট হয়ে যাওয়ার পর সবাই জেনে গেল। বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। ব্যস্! সুখের দিন শেষ। ব্যবসা কে দেখবে? মা একটা স্কুলের টিচার। মা ব্যবসা বোঝে না। আমিও না। আমার হাতে পড়েই ব্যবসাটা পটল তুলল, বুঝলে? হে হে হে... আমাদের বিশাল বাড়িটা বিক্রি করে দিল মা।

—লজ্জা করছে না নিজের এসব গুণকীর্তন গাইতে? একটা জানোয়ার!

—জানি তো আমি জানোয়ার! কিন্তু অতটা খারাপ নই, না হলে তোমায় এতক্ষণে রেপ করে ফেলতাম। বুঝলে বেবি? করিনি। তোমায় ভালোবাসি যে! তারিয়ে তারিয়ে খাব। আর চারটের সময় লোক আসবে তোমাকে নিতে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না! মনটা বড় খারাপ লাগছে গো সোনা! বলতে বলতে দুলে দুলে হাসছে আশিস।... ও হ্যাঁ, আমি তখন একঘরে। মা বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় বাপের বাড়িতে চলে এল। আর আমি বে-ঘর। আমাদের বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে দেখতাম এখন বাড়িটা অন্য লোকের! বুকটা ফেটে যেত!... একটা চুমু দাও, প্লিজ নিজে থেকে। দাও

বলছি। দেবে না? জোর করতে ভালো লাগে না আমার বুঝলে সোনা? ভিথিরি হওয়ার আগে পর্যন্ত মেয়েরা ঘরে এসে সেধে দিয়ে যেত নিজেকে সেসব দিন ছিল! হেঃ!

—দেবাশিসের ফেসবুক হ্যাক করেছিলে?

—হুঁ। দেখলাম টাকা যখন দিবিই না, তখন অন্য উপায়ে তোকে ভাঙিয়ে খাই। তুমি জালে পড়লে। শ্বেতা মাধোয়ানী, সঙ্গীতা কুমার, আরতি দাস এরা সব বড়লোকের সেক্সুয়ালি ফ্রাসট্রেটেড বউ! সব কটা গায়ে পড়ে লাফাচ্ছিল! হা হা। দাঁড়াও, তুমি তো বউ, তাই তোমায় শেয়ার করি। বলতে বলতে মোবাইল বার করল সে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র কয়েকটি মেয়ের ছবি দেখাল। হাসছে আশিস। বলল, এই হচ্ছে সব বড়লোকের বউ! খুব চুলকানি বুঝলে? তোমার মতো ভালো না। তুমি তো আমায় ব্রা প্যান্টি পরা ছবিও পাঠাওনি। আর এরা নিজেরাই... হে হে হে... সঙ্গীতা কুমারের বয়স আটান্ন। বুলে গেছে সব। হে হে তাও ছবি পাঠিয়েছে।

বমি আসছে লিজার। ভাবতে ভাবতেই বমি করে ফেলল সে। নোনতা জল বমি হয়ে উগড়ে এল।

তাতে বিন্দুমাত্র প্রক্ষেপ না করে লোকটা বলে

যাচ্ছে, এই তিনজনের ছবি ব্ল্যাকমেল করছি কয়েক বছর ধরে, হে হে...হাতে পায়ে পড়ে কাঁদে শালিরা। মায়া হল বলে দু'পাঁচহাজারের বেশি চাই না। আরে বাবা, আমিও তো একটা মানুষ না কি? মানবিকতা তো আমারও আছে। কী বলো বউ? এই যে তোমায় বিয়ে করতে পারছি না, বেচে দিতে হবে, তাতে আমার বুকে বাজে না নাকি?' ঢক্‌ঢক্ করে মদ গলায় ঢালল লোকটা।

—কী দিলে আমায় ছেড়ে দেবে?

—মাত্তা খারাপ নাকি তোমার? হে হে...তোমার মতো সুন্দরী এডুকেটেড মাল কেউ ছাড়ে? অসুবিধা কি বলো তো তোমার? এক দু'হাত ঘুরে সম্ভবত আরবে চলে যাবে। শেখদের হারেমে থাকবে, খাবে। নাচ দেখাবে। সেক্স করবে। মন্দ কী?...চুচ্‌চুচ্‌ করে জিভ দিয়ে শব্দ করল সে, বলল, সোনামণি, আমি জানি পাপ করেছি অনেক, তার শাস্তি তো আমার এই চেহারা। কিডনি গেছে। লিভার পচেছে। মাথার চুল নিয়ে কী স্টাইল ছিল একসময়ে... হে হে... আর আজ টাকলু! হাঃ হাঃ... যে ক'টা দিন বাঁচব তোমাকে বিক্রির টাকায় মাছভাত মদ খেয়ে চলে যাবে। তাই তোমাকে তো ছাড়া যাবে না সোনা! তুমি থাকলে

পুলিশে ধরবে। জেলহাজত বাস! বাব্বা! পুলিশকে বড় ভয় পাই একবার দশদিন ছিলাম লক-আপে। আরিব্বাস! ডেঞ্জার জিনিস! আর নয়...

লোকটাকে অদ্ভুত লাগছে লিজার। সেকেন্ডে সেকেন্ডে মদ ঢালছে গলায় আর বলে যাচ্ছে কথা। রাস্তার ভবঘুরে ভিখিরিরও অধম একটা লোক এত বড় ক্রাইম করতে পারে কী করে বোধগম্য হচ্ছে না।

—আপনি আমায় ছেড়ে দিলে পুলিশকে জানাব না।

লোকটা কেমন কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, কত দেবে তুমি? অ্যা? কত? তোমায় কত দেবে বেচছি জানো? সাত লাখ! হে হে... এটা আবার ভাগ হয়ে যাবে ছ'জনের মধ্যে।

—আমি তার বেশি দেব। মাথা ঠান্ডা রাখাই এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ চিন্তা করল লিজা। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাও। ভালো করে ট্রিটমেন্ট করাও। আর চুরি জোচ্চুরি ছেড়ে ভালো পথে এসে জীবনটা কাটাও।

কেমন হতভম্ব হয়ে গেল যেন লোকটা। লিজাকে দেখছে তো দেখছেই। তারপর অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলল, লে হালুয়া এ দেখি আমার মায়ের মতো কথা

বলে! হা, হা, হা,...। আরে সোনামণি, ওসব জ্ঞান ফ্যান আর ভালো লাগে না, বুঝলে? আমি তো আর বাঁচবই না। ডাক্তার বলে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার একটা ইচ্ছে আমার হয়েছিল মাইরি বলছি। মা কালীর দিব্যি। তোমার ছবি যখন দেখলাম, মনে হল, এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারলে লাইফ হ্যালোজেন বাতি হয়ে যাবে! হে হে হে...। তোমার দিব্যি।' কথা বলতে বলতে লিজাকে প্রায় টেনে নিজের কোলের ওপর নিয়ে এল লোকটা।

গা গুলিয়ে উঠছে লিজার। গন্ধ! অতি পচা দুর্গন্ধ লোকটার শরীরে। তার ওপর শায়ে কুষ্ঠ! ওয়াক্ তুলল লিজা।

—ঘেন্না করছ?

পাঁচজন এই মুহূর্তে অতন্দ্র ও স্নায়বিক উত্তেজনায়। তারাপদ আচার্য ঘনঘন ফোনে যোগাযোগ রাখছেন। অন্য অফিসার দুজনও বিভিন্ন সোর্সের সঙ্গে কথা বলছেন।

—হ্যালো! হ্যালো! থ্যাঙ্ক গড! আমরা কাল আর্লিয়েস্ট ফ্লাইটে আসছি।... অ্যারেস্ট হয়নি এখনও? লেট করবেন না তারাপদ আচার্যের মুখের

দিকে তাকিয়ে সবাই। চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করলেন তিনি।

ফোন রেখেই উত্তেজিত তারাপদ আচার্য চেয়ার থেকে উঠে পড়লে খুবই উত্তেজিত তিনি, বললেন, মনে হচ্ছে ব্রেক থু হচ্ছে।

—স্যার হাউ?

আলিয়ার কথার উত্তরে বললেন, ওয়েট।

ফোনে সংযোগ করার চেষ্টা করলেন আবার তারাপদ—হ্যালো! হ্যালো! অ্যারেস্টেড!

হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলো তারাপদ আচার্যের মুখে। টেবিলে সজোরে একটা ঘুসি মেরে বললেন, ধরা পড়েছে স্কাউন্ড্রেল! একটা ছিঁচকে লোক কিন্তু খতরনক। আমরা সব শুনব আর একটু পরেই।

—স্যার! সমবেত উচ্ছ্বাস চারজনের কণ্ঠস্বর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল।

ঋষি আর আলিয়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে মুহূর্তের আবেগে।

স্বস্তির হাসি তারাপদ আচার্যের মুখে। স্বস্তির হাসি আলিয়া ঋষির মুখে।

—স্যার! অ্যারেস্টেড? হাউ? ঋষি উত্তেজিত।

—ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ফার্স্ট আমি আমার তরফ

থেকে আপনাদের দু'জনকে ধন্যবাদ জানাব।

—ওয়েলকাম স্যার। বাট, আমাদের বড় মিসটেক হয়ে গেছিল আপনাদের প্রথমেই ইনফর্ম না করে। আসলে ম্যাম একেবারে চাইছিলেন না থানা পুলিশ হোক। তাই ওঁর রিকোয়েস্ট রাখতেই...

—বুঝতে পেরেছি। আজকাল এই ধরনের ক্রাইম এত বেড়ে গেছে! ভারুয়াল ওয়র্ল্ড! কেউ কাউকে না দেখেই বিশ্বাস করে ফেলছে। আমার কাছে এরকম ঘটনা কত জানেন!

—স্যার! আলিয়া কথার মধ্যেই বলে উঠল, স্যরি, একটু ইনটেরাপ্ট করছি স্যার...

—ইয়েস ম্যাম—

—দীপক দাশগুপ্ত বলে আরও একটি লোক ম্যামকে খুব ডিসটার্ব করছিল। আমরা সেটা ধরতে পেরেছি। উনি ম্যামের মুখ আর অন্য মডেলের ন্যুড ছবি মার্জ করে বিভিন্ন অ্যাডাল্ট সাইটে পোস্ট করেছেন। অ্যালং উইথ হার ফোন নম্বর! এটা যে দীপক করেছে তা আমরা জেনেছি ইনভেস্টিগেট করে। আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে কল আসছিল ম্যামের কাছে! আই হ্যাভ কালেকটেড অল দ্য ফোন নম্বরস্! এই ব্যাপারটাও স্যার একটু দেখবেন।

ক্রতে ভাঁজ তারাপদর। জুনিয়র অফিসার সুবর্ণকে বললেন, চ্যাটার্জি নোটডাউন করে নিন নম্বরগুলো ম্যামের কাছ থেকে।

ঋষি বলল, স্যার, লিজা ম্যাম ঠিক আছে তো?

—ইয়েস ইয়েস। গল্পটা হল, আগরতলা এয়ারপোর্টের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ওদের ছবি। ক্রিমিনালটা একটাই ভুল করে ফেলেছিল এয়ারপোর্ট থেকেই ট্যাক্সি নিয়েছিল। আর সেই সূত্র ধরেই ট্যাক্সির খোঁজ, ড্রাইভারের হুদিশ মিলতেই সমস্যার জট খুলেছে খুব সহজে।

ঋষি আর আলিয়া একসঙ্গে বলে উঠল, ওহ! থ্যাঙ্ক গড্।

—বাদবাকি কাল জানতে পারব। কাল দুপুরে ফ্লাইট আছে। আমরা যাচ্ছি। ক্রিমিনালকে নিয়ে আসতে হবে। ... আজ তাহলে নিশ্চিত মনে আপনারা দুজন যেতে পারেন বাড়িতে। এত ফাস্ট যে প্রবলেম সলভ্ হবে আমি ভাবতে পারিনি।

—সিওর স্যার। আমরা তাহলে...?

—কাল ফোন করব আপনাদের। কেস উঠবে এরপর। লোকটাকে ইন্টারোগেট করা আছে।

আপনারা দুজন যেহেতু মেইন উইটনেস, আপনাদের তো লাগবেই।

—তাহলে আজ আমরা উঠি? বাই দ্য ওয়ে স্যার, লিজা ম্যামের মাকে এখনও জানানো হয়নি!’

ঋষির কথায় মাথা নাড়লেন তারাপদ, রাইট। আপনারা জানিয়ে দিন। আমরাও অফিসিয়ালি জানিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের গাড়ি পৌঁছে দেবে আপনাদের।

লালবাজার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে যখন আলিয়া ঋষি বেরোল তখন রাত গভীর। শুনশান পথঘাট!

আলিয়া বলল, রাতের শহরটা কেমন অদ্ভুত না? একদম অচেনা।

—আমাদের মনের আলো আর অন্ধকারের মতোন!

ওস্তাদ! বস্! পুলিশ!—এইটুকুই কানে এল লিজার। আর চোখের সামনে দেখল ‘ওরে বাবারে’ বলতে বলতে কাঁপতে কাঁপতে দৌড় লাগাল আশিস নামের লোকটা। লোকটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

তুড়িৎগতিতে জানালার ফাঁকা অংশের দিকে ছুটে গেছে লিজা।

হতবাক্। সত্যিই পুলিশ! ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে।
আনন্দে উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন স্তব্ধ প্রায় তার।

পুলিশ তিনতলায় উঠে আসার আগেই সে নেমে এসেছে নিজে।

পুলিশ ভ্যানে ততক্ষণ তোলা হয়ে গেছে লোকটাকে ও তার এক সাকরেদকে। লিজার সন্দেহ হল আরেকজন পালিয়েছে বোধহয়। হাউ-পা কাঁপছে লিজার। মনে হচ্ছে এখনই পড়ে যাবে সে এতটাই স্নায়ু দৌর্বল্য! কীভাবে যে কী হুলস্থূল উঠতে পারছে না সে এখনও।

তরুণ এক অফিসার তাকে নিয়ে কোনওক্রমে পুলিশের জিপে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। বললেন, ম্যাম, আমরা আছি। ডোন্ট গেট নার্ভাস। সবকটাকে তুলে নিয়েছি।’

সরু রোগা হাড়হাভাতে চেহারার লোকটাকে দেখে লালবাজারের সাইবার ক্রাইমের গোয়েন্দা অফিসার চমকে গেছেন। ফুটপাথের ধারে অথবা মন্দির প্রাঙ্গণে বসে থাকা কুষ্ঠরুগিদের মতো চেহারা

নিয়ে একটা লোক এতবড় অপরাধ করে কী করে, সেটাই আশ্চর্যের বিষয় এখনও তাদের কাছে!

কোমর থেকে দড়ি খুলে নেওয়া হয়নি এখনও, লোকটার হাতে হ্যান্ডক্যাপ। শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চোখগুলো অস্বাভাবিক লাল। ঘাড় থেকে মাথা নিচু হয়ে ঝুলে পড়েছে।

—নাম কী তোর?

—স্যার! ছেড়ে দিন। আমি কিছু করিনি। মৃগীরুগির মতো কাঁপছে লোকটা। ‘স্যার! আমি কিছু করিনি স্যার!

—নাম কী?

—আশিস ঘোষ, ছেড়ে দিন। আমি আর বাঁচব না, ডাক্তার বলে দিয়েছে স্যার...।

প্রবলবেগে উঠে আসা হাসি কোনওমতে চেপে নিলেন তারাপদ আচার্য ও অন্য অফিসারেরা।

—কার বুদ্ধিতে একাজ?

—আমার না স্যার। আমার না...।

—তবে কার?

—জানি না স্যার।

—প্রচুর মার খাবি। তোর পেছনে আর কে আছে?

—কেউ না স্যার।

—লেখাপড়া কদুর?

—ইন্টার, স্যার।

—নিজা চৌধুরিকে সাবজেঙ্ক করলি কেন?

—মেয়েটাকে ছবিতে দেখে ভালো লেগেছিল, স্যার।

তারাপদ আচার্য আর হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। হেসে ফেললেন এইবার। অফিসাররাও হাসছেন। বলাবলি করছেন, রসিক মাল!

—তাই? তারপর কী হল? দেবাশিসকে?

—আমার পিসতুতো ভাই। পাইলট স্যার।

—তাই তুইও পাইলট?

—ইচ্ছা ছিল স্যার।

—ভাইয়ের আইডি হ্যাক করে এইসব করছিলি? মেয়েদের পটিয়ে পয়সা রোজগার।

—স্যার! কী করব? স্যার, আমার একারই দোষ দেখছেন। আমায় ছেড়ে দিন স্যার...। বড়লোকের বউগুলো যে কী খচ্চর মাল হয় জানেন না স্যার! একটু সুড়সুড়ি দিলেই ন্যাংটো! হে হে...। বলেই মাথা নিচু করল।

শরীরে আবার কাঁপুনি হচ্ছে লোকটার। থেকে

থেকেই কেঁপে উঠছে দেখে তারাপদ বললেন,
কাঁপছিস কেন?

—ভয়ে স্যার। পুলিশকে ভয় পাই। স্যার ছেড়ে
দিন। ছেড়ে দিন না স্যার...।

—চোপ্! অপরাধ করার সময় খেয়াল থাকে না?
বাড়ি কোথায়? কে আছে বাড়িতে?

—রাস্তায় থাকি স্যার। ফুটপাথে, ক্লাবে, কখনো
পার্ক। আর আন্ডার- কনস্ট্রাকশন বাড়িগুলোতে...
ওটা তো ফাইভ স্টার হোটেল, স্যার। স্যার, আর
করব না।

—মাথায় তো বুদ্ধি অনেক। বুদ্ধি। এইসব হ্যাকিং
ট্যাকিং শিখলি কোথা থেকে? বাড়িতে কেউ নেই?

মাথা নাড়ল লোকটা, মা ছিল। নেই। বাবাও।
বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল মা। স্যার, সব বলব
স্যার, ছেড়ে দেবেন বলুন। ভিক্ষা করে খাব তবু আর
এসব কাজ করব না, কথা দিচ্ছি। প্রমিস।

বম্বে গেছিলাম স্যার ছোটবেলাতেই। হাতে কাঁচা
পয়সা, বাবার ব্যবসা, মা-ই দিত পয়সা। আর মেয়েরা
তো জানেনই স্যার, পয়সাওয়ালা ছেলে দেখলেই...
মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে আনতাম। মা-ই বলত স্যার,
বাইরে কিছু করবি না। যা করবি ঘরের মধ্যে।

তারাপদর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, বাব্বা!

—স্যার, ক্লাস নাইনেই সেক্স করেছি। মায়ের স্কুলের এক স্টুডেন্টের সঙ্গে। কেলোটা হয়ে গেল মাইরি, পিসুতো বোন প্রেগনেন্ট হয়ে গেল যখন। বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। মা বাড়ি বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে গেল। আত্মীয়স্বজন খুব খারাপ জিনিস স্যার। যারা আমাদের বাড়িতে এসে খেয়ে যেত তারাও আমায় দেখে দরজা বন্ধ করে দিল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। হোটেল থেকে চেয়ে খেতাম...। পার্কের বেঞ্চে শুতাম। এই সময় পাড়ার এক দাদা ওর ভিডিওর দোকানে কাজ দিল। বলল, কাজ করবি দোকান খুলবি, মাল বেচবি। রোজকার টাকা হাতে হাতে পাবি। দিনে ষাট টাকা স্যার—।

রেকর্ডার অন। লোকটার কথা বন্দি হচ্ছে রেকর্ডারে। পিনড্রপ সাইলেন্স এই মুহূর্তে ঘরে।

—স্যার, ছেড়ে দেবেন তো? আমার লাইফ হিস্টি শুনলে আপনার চোখে জল আসবে স্যার...! একটা ছেলে কেমন করে পথের ভিখিরি হয়ে গেল।

—তাই?

—হ্যাঁ স্যার—।

—বলে যা।

—ওই দোকানে বসেই হ্যাকিং করা শিখেছি।
 ব্যাডলাক্! লোভ বড় খারাপ স্যার, বুঝলেন? ষাট
 টাকায় কী হয় বলুন? বিড়ি সিগারেট ভাত হয়? হয়
 না। তাই চুরি করছিলাম ডিভিডি সিডি। ধরা পড়লাম।
 লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল আমায়! অনেক বললাম,
 পায়ে পর্যন্ত ধরলাম। বললাম, মাইনে একটু বাড়িয়ে
 দিলে আর করব না। শুনলই না। খিস্তিখাস্তা করল,
 বলল, কুত্তার বাচ্চা। শুষারের বাচ্চা...! আবার
 ফুটপাথ।... গান শুনতে ভালোবাসি স্যার। তাই
 মোবাইলটা এত কষ্টেও বিক্রি করিনি। লোকের
 ফাইফরমাশ খেটে যা পেতাম দুদশটাকার নেট ভরে
 গান শুনতাম। স্যার, ফেসবুক যে কত বড় বন্ধু হতে
 পারে আমি জানি। আমাকে দেখে সবাই তখন মুখ
 ঘুরিয়ে চলে যায়। তো কী করব? মাঝে মধ্যে পয়সা
 হলে নেট করতাম। নেশা হয়ে গেছিল স্যার। ফেসবুক
 হল ড্রাগের নেশার মতো! একবার যাকে ধরবে...!

—জ্ঞানপাপী দেখছি! বলে যা।

—ছেড়ে দেবেন তো স্যার? আপনার বাড়িতে
 ময়লা সাফ করে দেব স্যার। কথা দিচ্ছি;

—বাজে না বকে বলে যা।

—স্যার। ফেসবুকে আমার ছবি দিতাম না। তাহলেই তো বুঝতে পারছেন... হে হে...। পিসতুতো ভাই দেবাশিসকে একদিন ফেসবুকে পেলাম। শালা হ্যান্ডসাম বটে! অথচ ছোটবেলায় দুজনে বেরোলে মেয়েরা আমার পেছনে লাইন মারত। ফুলটুস চেহারা ছিল স্যার আমার। এখন আমি আয়নায় নিজের মুখ দেখি না! ঘেন্না লাগে নিজেকে! শুয়োরের মাংস আর চোলাই খেয়ে শ্বেতী হয়ে গেল! ভাইকে ফেসবুকেই লিখলাম, কিছু টাকা লোন দিবি? ব্যবসা করব। ফেরত দিয়ে দেব। তোর তো অনেক টাকা। হাজার হোক আমি তোর ভাই। মাফ করে দিস আমায়। দিল না স্যার। লিখল, গো টু হেল্ড আমারও জেদ চেপে গেল। চ্যালেঞ্জ করলাম তোর ফেসবুক ব্যবহার করেই টাকা কামাব।... আশিস হয়ে গেল দেবাশিস! হে হে...! স্যার, আপনার পায়ে পড়ি...। আগে প্রোফাইল পিকচার ছিল না বলে মেয়েরা অত পাত্তা দিত না। তবে স্যার, এই ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে সমাজটাকে চিনতে পারবেন। বিশেষ করে বড়লোকের ফ্রাসট্রেটেড বউগুলো! হাই বিউটিফুল বলুন, জামাকাপড় খুলে ফেলবে! আমি তো এই সুযোগটাই নিয়েছি স্যার। এই যে মেয়েগুলোর ন্যাংটো ছবিগুলো পেলেন আমার

ফোনে তা তো আর আমি জোর করে আদায় করিনি! একটু নেড়ে দিয়েছি, ব্যস্। আমিও ভাবলাম এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা! ওদের থেকে টাকা নিতাম। ওই যে তপা দাশ, ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আসত ও আর রবি তার থেকে ফিফটি পারসেন্ট রেখে দিত।

মাথা হেঁট করে বসে থাকা তপা দাশ নামের মাঝবয়সি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন তারাপদ, কী? ঠিক বলছে?

—আজ্ঞে স্যার।

—বলে যা।

তবে বেশি চাইতাম না স্যার। অত অত টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়লে তো আগেই এনকোয়েরি বসে যেত। তাই দশ বিশ, পাঁচ এরকম চাইতাম।... আমার কি খুব দোষ স্যার? বউগুলোর অনেক পয়সা। একটু উসকে দিলেই যদি পয়সা আসে—।

হাসলেন তারাপদ সঙ্গী অফিসারদের দিকে তাকিয়ে, বললেন, জিনিস একটা!... বলে যা—।

—স্যার, লিজা চৌধুরির প্রোফাইলটা এভাবেই পাই ফেসবুকে নিউজ ফিডে। একদম প্রতিমার মতো! ভালোবেসে ফেলেছিলাম স্যার। সত্যি। সেই দিনকাল

থাকলে বিয়ে করতাম। কিন্তু বিয়ে যখন করা যাবেই না তখন অন্য চিন্তা মাথায় এল। তপাদাই প্ল্যানটা দিল, বলল, বেচে দে। ভালো মালকড়ি পাওয়া যাবে। অরুণাচলে এক লোক আছে, মেয়ে ছেলে আর ড্রাগের বিজনেস করে। তপাদার চেনা...।’ খক্খক্ করে অনেকক্ষণ কাশল লোকটা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ভেবেছিলাম এই শেষ পাপ। বাঁচব তো না আর এমনিই, লাখখানেক টাকা পেলেই আগরতলা ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম।

—কোথায়?

—তা তো জানি না স্যার। তবে আর এই নোংরা শহর পরিবেশ ভালো লাগছে না স্যার। দুবেলা দুটো ভাত খেয়ে মদ খেয়ে পড়ে থাকতাম কোথাও। তারপর তো মরেই যেতাম। দুটো কিডনি ড্যামেজ! লিভার পচে আর কিছু নেই বাকি! কুষ্ঠ ব্যাধি ধরেছে। হাঃ! আর বাকি রইল হার্ট! সে তো মেয়েদের দিতে দিতেই শেষ! হা হাঃ। আমায় ছেড়ে দেবেন স্যার? আর তো বেশিদিন বাঁচব না! জেলের অন্ধকারে পচে গলে মরতে চাই না। একটু সুখে মরতে চাই, স্যার।

—দীপক দাশগুপ্ত বলে কাউকে চিনিস?

লাফিয়ে উঠল লোকটা। হ্যাঁ স্যার। ওই লোকটা

লিজার লাভার ছিল। সে মাল আমার থেকেও খারাপ স্যার। সে আবার লিজার প্রোফাইল হ্যাক করে আমার আর লিজার সম্পর্ক জানতে পেরেছিল। আমি তো তখন লিজার সঙ্গে প্রেমের অ্যাক্টিং করছি। আর ও শুয়ারের বাচ্চা... স্যরি স্যার মুখ খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ ওই লোকটা ভেবেছে ব্যাপারটা সত্যি। তার আগেই ওই মাল ল্যাঙ খেয়েছে লিজার কাছ থেকে। তাই স্কেপে ছিল। আমায় নক করে লিজার কিছু ছবি পাঠাল। আমিও তো জানি কোন ছবি ফলস্ আর কোনটা রিয়েল। বুঝলাম লিজার মুখ আর কটা ন্যাংটো মেয়ের বডি জুড়ে দিয়েছে। লোকটা লিজার নামে বাজে কথা বলল অনেক। বেশ্যাটেশ্যা বলে খিস্তি দিল। এইটুকুই স্যার...

—ড্রাগ পেডলিং করেছিল?

—না স্যার।

—চোপ। আমাদের কাছে খবর আছে।

চুপ করে গেল লোকটা।

তারাপদ আচার্য সহকারী অফিসারদের বললেন, কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে কালই। আর ওই দীপক নামের লোকটাকে অ্যারেস্ট করে ল্যাপটপ, মোবাইল সব সিজ্ করে দেবে। প্রমাণ মিলবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

—ওঃকে স্যার। এখনই বেরোব?

—অ্যাড্রেস নিয়ে যান।

উৎসাহী উদ্যমী দুই তরুণ অফিসার আর কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন।

—এর ভাইয়ের সঙ্গে কনটাক্ট করো, যার প্রোফাইল হ্যাক করেছে। অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে লোকটাকে তারাপদ বললেন, তোর কোনও গুরু আছে নাকি?

—না স্যার। একলাই, স্যার... অভাব দোষে নষ্ট হয়েছি স্যার। মাফ করে দিন।

—শোন্ এত বুদ্ধি তোর! তুই স্বীকার কর। কে আছে আর তাহলে তোর শাস্তি কম করে দেব। শাস্তি পাবি, কিন্তু কম।

—স্যার। নেফা বর্ডারে আছে একজন। দেখিনি আমি। ফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার।

—নাম?

—হরিশ তামাং। লোকটা মাগী ব্যবসা করে স্যার। ওর অনেক চ্যানেল।

—ফোন নম্বর দে। এর আগে কোনও মেয়ে পাচার করেছিল?

—মা কালীর দিব্যি স্যার, না। লোকটার সঙ্গে

আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল তপাদা।
ফোনে...। আমায় বলল, তুই তো ইংলিশটা ভালো
জানিস, তুই ভালো চিড়িয়া পটাতে পারবি। ভালো
রোজগার আছে।

—কী? তপাবাবু? ঠিক বলছে?

—আমি হরিশ তামাংকে একবার মিলেছিলাম
মদের ঠেকে স্যার। মাল খেতে এসেছিল। তারপর
কথা হয়েছিল। বাবুদা বলে মাছ ব্যবসায়ী একজন
আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্যার। লোকটা বেশ্যাখানায়
মেয়েছেলে সাপ্লাই দেয়, স্যার।

—তোমরা কটা সাপ্লাই করেছ?

—আজ পর্যন্ত একটাও ন্যাস্যার। ঘরে বউ বাচ্চা
আছে।

—বউবাচ্চা আছে তো এইবার কী করছিলে?

—স্যার! খুবই হাতটান অবস্থা! তাই...। ও যখন
লিজা নামের মেয়েটার কথা বলল, ফেসবুকে ছবি
দেখাল, বলল, লাইন মারছে নাকি, তখন পেলানটা
দিলাম। সুন্দর আর শিক্ষিত মেয়েছেলের দাম বেশি
বলেছিল ওই তামাং লোকটা।

জুনিয়র আরেক অফিসার মাধবী দাশের দিকে
তাকিয়ে হাসলেন তারাপদ, বললেন বুঝতে পারছেন

মিস দাশ? আন্তঃচক্র মেয়ে ব্যবসা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে!

—ইয়েস স্যার।

—আপনাকে এই কেসটায় আমি চাই মিস দাশ।

—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার।

—ফোন নম্বর দে।... ওংকে, এখান থেকে ফোন কর তামাংকে। বল, মাল এসে যাবে কাল। ডেলিভারি কীভাবে দেব? ফোন লাগা। বলতে বলতেই আধবীকে বললেন, আগরতলা পুলিশ না জেনেই একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছে। ভোরের দিকে লিজা চৌধুরিকে হ্যান্ডওভার করা হত। লোক আসত। সেই মালগুলো ফস্কে গেল। তার আগেই তো এদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে!

এবার চিৎকার করলেন তারাপদ, ফোন লাগাও।

—হ্যাঁ তামাংজি, মাল আসছে, বড়িয়া।... কলকাতার মাল।... লেখাপড়া জানা, সুন্দর। টোপ গিলেছে। মাল নিয়ে আসছি। দুপুরের ফ্লাইটে আনব। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখার রিস্ক নেব না।... লোক পাঠাচ্ছেন? রাতে তো... ঠিকানা? বলবেন কালীবাবুর বাজার। যেখানে মালের ঠেকে মিট করেছিলাম

আমরা। ফোন করতে বলবেন এসে যদি জায়গা চেঞ্জ হয়, তাই বলছিলাম।... আচ্ছা জি। আচ্ছা।’

ফোনের লাইন কেটে দিয়ে তপা দাশ বলল, স্যার। নিজে আসবে না। লোক পাঠাবে।

—ঠিক আছে। এখন অনেক হাঙ্কা লাগছে তারাপদর। একটা বড় চক্রের হৃদিশ মিলেছে।

আগরতলা পুলিশকে বিষয়টা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দিলেন এইবার ফোনে তিনি।

—স্যার! কাল ওরা এসে লোকটাকে ফোন করলে তো লাভ হবে না। মাধবী বললেন।

—কেন?

—লোকটা বরং এখনই ফোন করে জানিয়ে দিক যেখান থেকে এরা অ্যারেস্টেড হয়েছিল সেই জায়গাতেই ওই তামাং-এর লোককে আসতে। আগরতলা পুলিশ আগে থেকেই সিভিল ড্রেসে থাকবে আশপাশে। কারণ কাল ওরা ফোন করবে এই লোকটাকে, তারপর সে জায়গা বলবে, তারপর আমরা আগরতলা পুলিশকে জানাব সেটা হচ্‌পচ্‌ হয়ে যাবে না স্যার?

তারপদ উচ্ছ্বসিত, বললেন, যু আর রাইট... এই

যে তপাবাবু লোকটাকে ফোন করে আপনারা যে বাড়ি থেকে অ্যারেস্টেড হয়েছিলেন সেই প্লেসটাতে আসতে বলে দিন। আর আগরতলায় পৌঁছেই যেন ফোন করে আপনাকে।’

—আচ্ছা স্যার।

মনমেজাজ বেশ ফুরফুরে লাগছে তারাপদর। বেশ বড় একটা কাজ খুব সহজেই হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই মন প্রফুল্ল।

মাধবীকে বললেন, ওই একটা থেকে আরও বড়চক্র ধরা পড়বে, বুঝলেন?

—হ্যাঁ স্যার। প্রতিদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই যে কত পাচার হচ্ছে! গরিব মেয়েগুলো তো কাজের আশায়, বিয়ের জালে পা দিয়ে পাচার হচ্ছেই, ভালো বড় ঘরের মেয়েরাও! ইন্টারনেট ফেসবুক-টুক যেমন গুড প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করতে পারে একদল একে ব্যবহার করছে এইসব কাজে। আর আমাদেরও দায়িত্ব আছে কিছু স্যার। মানে একদিন বা সপ্তাহে একদিন করে যদি আমরা পুলিশ থেকে কোনও টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে এই ব্যাপারে ওয়র্কশপ করি? কেমন হয় স্যার? লাস্ট উইকে মেধা ভাগনানীর

কেসটাই ভাবুন স্যার! একইসঙ্গে মেডিকেল পড়ে ক্লাসমেটের সঙ্গে প্রেম করে এখন ব্ল্যাকমেইলড হচ্ছে!

—রিয়েলি ইটস্ অল আর শকিং!

—মেয়েরাও আজকাল নিজেদের রেসপেক্ট করছে না মিস দাশ।

—আমি তো সেটাই মাধবীকে বললাম, প্রেম করছ করো। কিন্তু ন্যুড ছবি কেন তুলছ? সেক্স ভিডিও করার সময়ে তোমার এক্সপ্রেশন দেখেই বোঝা যাচ্ছে দ্যাট টাইম যু ওয়্যার অ্যাওয়ার।

—এরকম তো আরও কয়েকটা কেস আছে।

—ইয়েস স্যার। তাই বলছিলাম আমরা পুলিশ থেকে যদি কিছু করতাম। প্রিন্সিপাল ইজ বেটার দ্যান কিওর। এখন গ্রামেও ঘরে ঘরে টিভি স্যার। সবাই সচেতন হলে বিজনেসটাকেই কিছুটা কন্ট্রোলে আনা যাবে স্যার।

—ওয়েল মেড মিস দাশ। আমি মিটিং-এ প্রোপোজালটা দেব।

লক আপে নিয়ে যাওয়া হল আশিস ঘোষ, তপা দাশদের।

—স্যার, সব বলে দিয়েছি, আমার শাস্তি মকুব

করে দেবেন তো স্যার? তখনও বলে যাচ্ছে আশিস ঘোষ।

সকাল সকালই হাজির হয়েছে আলিয়া ঋষি লিজার বাড়িতে।

লিজাকে এই মুহূর্তে চিয়ার আপ করাই বড় কাজ। যে ঝড় তার ওপর দিয়ে গেছে তাতে ট্রমাটাইজড হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

পথে যেতে যেতে আলিয়া বলল, ম্যামকে ইনসিডেন্টের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করব না আমরা। অন্য গল্প করব। বুঝলি? ট্রমা কাটা দরকার।

সহমতো ঋষি। বলল, একজ্যাক্টলি, তবে আমরা কিছুই করতে পারলাম না এই কেসে। সেই থানা পুলিশ!

—দেখ, এটা ইলিগাল উইমেনস্ ট্রাফিকিং, সাইবার ক্রাইমের আওতায় পড়ে। প্রাইভেটলি তো আমরা কিছু করতে পারি না পুলিশকে না জানিয়ে। তাছাড়া এত ফাস্ট ঘটনাগুলো ঘটে গেল! আমাদের এখন ম্যামের পাশে থাকা জরুরি। মোটিভেট করা দরকার। সি হ্যাজ লস্ট হার ফেইথ অন হিউম্যান বিং। সেটা রিকভার করতে হবে।

দরজা খুলে দিলেন লীলাদেবী। বাড়ির মধ্যে
দুকতেই মৃতপ্রায় মনে হল বাড়িটাকে।

লীলাদেবী এক রাতে আধখানা হয়ে গেছেন যেন!
বললেন, একদম কথা বন্ধ হয়ে গেছে ওর।

—খাওয়া দাওয়া? করেছে?

—না। শুধু চা খেয়ে আছেন কাল থেকে।
সারারাত ঘুমাননি। কাজের লোকটাকেও বিশ্বাস
করছেন না। আমিও ওঁর পাশে জেগে বসে সারারাত।
ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডক্টর। তাতেও লাভ হয়নি কিছু।
অনেকক্ষণ পরপর বলছেন, আমার সঙ্গে এরকম হল?

—আমরা কথা বলি আন্টি? বেটার ম্যামকে
সাইকোলজিস্ট কনসাল্ট করানো। এই ট্রমা না হলে
কাটবে না। কত বড় একটা ট্রমা ভাবুন।

—আমিও তো ঘুমুতে পারি না মা! খালি মনে
হচ্ছে এই বুঝি কেউ এল! পুলিশ অফিসার এসেছিল
দু'জন। একজন লেডি অফিসার। কথা বলে গেল।
ওঁরাও বুঝিয়ে গেল।... যাও ঘরে যাও। বেডরুমে বসে
আছে।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে লিজা। বাইরে
খোলা জানালার দিকে দৃষ্টি।

—ম্যাম!

আলিয়ার ডাকে ফিরে তাকাল লিজা। কিছু বলল না।

—ম্যাম্! কেমন আছেন?

উত্তর এল না প্রত্যাশা মতোই।

—ম্যাম্! সব কটা ধরা পড়েছে। আর ভয় নেই।
লেটস্ সেলিব্রেট ম্যাম্।

—ম্যাম্! কেক খাব। মজা করে বলল ঋষি। লীলা দেবী বললেন, আমিও ভাবছিলাম।

—আমরা কেক নিয়েই এসেছি ড্রাস্টি। আজ আমরা সেলিব্রেট করব, ম্যাম লেটস্ এনজয়।

—ওরা আবার আসবে! কেমন অসহায়ের মতো বলল লিজা!

—আর কেউ আসবে না। একটা বড় চক্র ধরা পড়তে চলেছে কাল। জাল ফেলা হচ্ছে এই কেসটার সূত্র ধরে।

—কীসের?

লীলাদেবী বললেন, যাক তোমরা আসাতে তাও কথা বলছে! পুলিশের সঙ্গেও কথা বলেনি!

লিজা আবার বলল, কীসের?

—উইমেনস্ ট্রাফিকিং চলছে সারা দেশজুড়ে। আপনার কেসটা দেখতে গিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে

আসছে। বড়বড় লোকজন ধরা পড়বে এবার। তাই আমরা এটাকে সেলিব্রেট করব ম্যাম। আলিয়ার গলায় বিশ্বাস আর নির্ভরতার সুর। বলল, ম্যাম, আপনার এই ঘটনাকে আমরা পজিটিভলিও তো নিতে পারি? হয়তো বড় কোনও কিছুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম আমরা?

—আমাকে ওরা বিক্রি করে দিচ্ছিল! নিমেষে পাংশুটে বর্ণ হয়ে গেল লিজার মুখ। আমি না ঈশ্বরকে ডাকতেও ভুলে গেছি তখন।

—দেখুন ঈশ্বর আমাদের সহায়। আপনার তো কোনও ক্ষতি করতে পারেনি ওরা!

—হুম্। লোকটা বসে বসে ওর হিস্ট্রি বলে যাচ্ছিল! খুব গন্ধ! নাক থেকে যাচ্ছে না!... এতক্ষণে আমি বিক্রি হয়ে কোথায় চলে যেতাম! ভয়াব্র্ত মুখ লিজার।

—লেটস্ ফরগেট। আমরা বরং এখন এই উইমেনস্ ইন্লিগ্যাল ট্রাফিকিং নিয়ে কাজ করতে পারি। আপনি যথেষ্ট সাহসী। আসুন না আমরা এক সঙ্গে কাজ করি?

আলিয়ার কথায় অদ্ভুতভাবে তাকাল লিজা। যেন বোধগম্য হচ্ছে না তার কিছুই।

ঋষি বলল, কেকটা কাটা হোক। ম্যাম আপনি—
ফিরছে। ধীরে ধীরে চেতনায় ফিরছে লিজা। কেক
কাটা হল।

অসহায়ের মতো বলল, জানো আমি আর কাউকে
বিশ্বাস করতে পারব না!

—পারবেন। আমরা এই অপরাধগুলোর এগেইনস্টে
কাজ করব একসঙ্গে, তারাপদদার সঙ্গেও কথা
হয়েছে।

—পারব?

—হ্যাঁ। পারব। অনেক মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে রোজ
এইভাবে ম্যাম। আমরা পারব।

ঋষির কথার সঙ্গে সঙ্গেই আলিয়া বলল, আমরা
একটা এন.জি.ও. ওপেন করব বলে প্ল্যান করেছি।
সোসাইটির ফেমাস পার্সোনালিটিদেরও ইনভাইট
করব। পুলিশও থাকবে। আর অবশ্যই আপনি।

একটু কি উজ্জ্বল দেখাল নিজার মুখ? একটু যেন!

—থাকবেন তো?

মাথা নাড়ল লিজা, হুঁ।.... ওই লোকটাকে আমার
কয়েকটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করছে আলিয়া।

ফিরছে ধীরে হলেও ছন্দে লিজা। লীলাদেবীর মুখে
প্রশান্তির এক টুকরো বাতাস।

এই কটা দিন কলেজে যাওয়া হয়নি। ক্লাস করা হয়নি ঋষি-আলিয়ার।

আজ সকাল সকাল ক্লাসে গেছে দুজনেই। বিকেলের দিকে ওদের প্রিয় লাইব্রেরির পাশে পুকুর সংলগ্ন মাঠে গিয়ে বসল দুজনে।

—এন.জি.ও.-র প্ল্যানটা এইবার ফুটফুল করতে হবে। আলিয়ার কথায় সায় দিল ঋষি, সেন্ট পার্সেন্ট। তারাপদদার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে জেনে নিই কীভাবে কী করতে হবে। পুলিশ হেল্প তো লাগবেই। বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এই ক্রিমিনালরা খতরনক হয়। ইন্টারন্যাশনাল চক্রগুলোর সঙ্গে কাজ করে এরা। যে দুজন ধরা পড়ল এরা তো পুঁটি মাছ!

—কাল তো বড় একটা অপারেশন হতে চলেছে।

—হুম্! তামাং-এর লোককে ধরে তামাং পর্যন্ত রিচ করতে পারবে পুলিশ। তামাংকে ধরে আরও বড় চাঁই। স্টেপ বাই স্টেপ। বড় বড় নেতা মন্ত্রীরাও জড়িয়ে পড়তে পারে।

—আই ডোন্ট কেয়ার ঋষি। এন.জি. ও. আমরা করবই। উই হ্যাভ টু ডু সামথিং ফর আওয়ার সোসাইটি।

—ইয়েস উই হ্যাভ টু। হোপ উই উইল ক্রিয়ার দ্য গার্বের্জ।

মাথা নাড়ছে আলিয়া, ইয়েস।... জানিস এখনও ভাবছি কোন মানুষকে বিশ্বাস করবি তুই? টেকনোলজির জন্য হোল ওয়ার্ল্ড আজ ঘরের মধ্যে! এই সুযোগে ক্রিমিনালরাও ইজিলি ঘরে ঢুকে পড়ছে!

—দেখ, মানুষের ওপর ভরসা রাখতেই হবে। আর উই ক্যান নট ডিনাই দ্য টেকনোলজি বাট হ্যাভ টু বি কশাস। আগেও মানুষ ভালো খারাপ ছিল। এখনও আছে। সো হতাশ হওয়ার কিছু নেই। লেট্‌স হোপ ফর দ্য বেস্ট ডিয়ার।

আলিয়ার ফোন বেজে উঠল তখনই।

—ম্যাম!

—কথা বল।

—হ্যালো ম্যাম!

—ওই লোকটার সামনে আমাকে একবার নিয়ে যাবে? ওকে কয়েকটা থাপ্পড় মারতে চাই আলিয়া।

—সিওর ম্যাম।

ফোন রেখে দিয়ে হাসল আলিয়া। প্রত্যয়ের হাসি। বলল, ম্যামকে দিয়ে হবে। কোনও কোনও ঘটনা

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

অন্তর্জাল ১৪৩

আপাত নেগেটিভ মনে হলেও তার পজিটিভ দিকও আছে একটা। ম্যাম এখন অনেক পাওয়ারফুল। সি ইজ রেডি টু ফাইট এগেইনস্ট এভার অড। এই ঘটনা ওঁকে কমপ্লিট একটা চেঞ্জ এনে দিল। আগের মতো আর টিমিড নন। থ্যাঙ্ক গড্! উই উইল উইন ঋষি। উই উইল।
